উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল— 'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল'/'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

'UGC (Open and Distance Learning programmes and Online Programmes Regulations, 2020' অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক— উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস. পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন— যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এই উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক পাঠক্রম : বাংলা

জেনেরিক ইলেক্টিভ্ কোর্স : ২

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : আধুনিক যুগ

(GE-BG-21)

মডিউল : ১,২,৩,৪ Module : 1,2,3,4

প্রথম মুদ্রণ : অগাস্ট, 2021
First Print : August, 2021

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক পাঠক্রম : বাংলা

জেনেরিক ইলেক্টিভ্ কোর্স : ২

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : আধুনিক যুগ

(GE-BG-21)

মডিউল : ১,২,৩,৪ Module : 1,2,3,4

	লেখক Course Writer	সম্পাদনা Course Editor
মডিউল : ১ Module : 1 (পর্যায়)	ড. আত্রেয়ী সিদ্ধান্ত সহকারি অধ্যাপক, ইন্দাস মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া	অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল ও অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল
মডিউল : ২ Module : 2 (পর্যায়)	ড. পম্পা মুখোপাধ্যায় সহকারি অধ্যাপক, চাঁপাডাঙ্গা রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	
মডিউল : ৩ Module : 3 (পর্যায়)	ড. তপন দত্ত সহযোগী অধ্যাপক, শম্ভুনাথ কলেজ, বীরভূম	
মডিউল : ৪ Module : 4 (পর্যায়)	ড. প্রতুলকুমার পণ্ডিত	

স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি

ড. শক্তিনাথ ঝা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ
বাণীমঞ্জরী দাস, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা, বেথুন কলেজ, কলিকাতা
ড. নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা
ড. চিত্রিতা ব্যানার্জি, সহযোগী অধ্যাপিকা, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা
আব্দুল কাফি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ড. অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
ড. প্রতুলকুমার পণ্ডিত, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ ও
অধিকর্তা, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণা

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনমুর্দ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

কিশোর সেনগুপ্ত
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
স্নাতক পাঠক্রম

জেনেরিক ইলেক্টিভ্ কোর্স : ২ (GE-BG-02)
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আধুনিক যুগ

মডিউল (পর্যায়) ১ : গদ্য ও প্রবন্ধ

একক ১ ❑ বিদ্যায়তনিক চর্চায় বাংলা গদ্যের প্রয়োজনীয়তা ১১

একক ২ ❑ উনিশ শতকের গদ্য চর্চায় বাংলা সাময়িক পত্র ১৬

একক ৩ ❑ বাংলা গদ্যের বিকাশে রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) ১৮

একক ৪ ❑ বাংলা গদ্যের বিকাশে বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ২২

একক ৫ ❑ বাংলা গদ্য ও প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) ২৬

একক ৬ ❑ গদ্যকার ও প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ৩০

মডিউল (পর্যায়) ২ : কাব্য-কবিতা

একক ৭-১২ ❑ কাব্য কবিতার ধারা ৪১-৭৬

মডিউল (পর্যায়) ৩ : বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের ইতিহাস

একক ১৩ ❑ বাংলা নাট্য ও রঙ্গমঞ্চের আদিপর্ব ও রামনারায়ণ তর্করত্ন ৭৯

একক ১৪ ❑ নাট্যকার মধুসূদন দত্ত ও নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ৮৬

একক ১৫ ❑ নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক ৯৩

একক ১৬ ❑ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক ৯৯

একক ১৭ ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক ১০৩

একক ১৮ ❑ বিজন ভট্টাচার্যের নাটক ১০৭

মডিউল (পর্যায়) ৪ : উপন্যাস ও ছোটোগল্প

একক ১৯ ❑ বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ ১১৫

একক ২০ ❑ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ১২১

একক ২১ ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ১২৮

একক ২২ ❑ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) ১৩২

একক ২৩ ❑ অন্যান্য ঔপন্যাসিক ১৩৪

একক ২৪ ❑ বাংলা ছোটোগল্প ১৩৭

মডিউল-১

গদ্য ও প্রবন্ধ

মডিউল (পর্যায়) ১ : গদ্য ও প্রবন্ধ

গঠন

উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

একক ১ বিদ্যায়তনিক চর্চায় বাংলা গদ্যের প্রয়োজনীয়তা

একক ২ উনিশ শতকের গদ্য চর্চায় বাংলা সাময়িক পত্র

একক ৩ বাংলা গদ্যের বিকাশে রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)

একক ৪ বাংলা গদ্যের বিকাশে বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

একক ৫ বাংলা গদ্য ও প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

একক ৬ গদ্যকার ও প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

অনুশীলনী

উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

বাংলা গদ্য রচনার উদ্ভবের ইতিহাস বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে ভাষার কথা। মানুষই একমাত্র জীব যার অর্থবহ ভাষা আছে। তবে এই ভাষা একদিনেই তৈরি হয়নি। তা তৈরি হতে লেগেছে বহু যুগ। যত দিন গেছে শব্দের ভাণ্ডার যেমন বেড়েছে তেমনই বাক্যও অর্থবহ হয়েছে, উচ্চারণ স্পষ্ট হয়েছে। এরপর সেই ভাষাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে অনেক পরে। যখন সাহিত্য তৈরি হতে শুরু হয়েছে তখন ভাষাকে হতে হয়েছে অনেক মার্জিত। সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে ভাষা ছিল পদ্য নির্মিত ছন্দোবদ্ধ। কারণ আদিযুগের সাহিত্য তাত্ত্বিকেরা মনে করতেন ছন্দোবদ্ধ ভাষাই সাহিত্য রচনার উপযুক্ত ভাষা। এভাবেই আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্য তাত্ত্বিকেরা মনে করতেন ছন্দোবদ্ধ ভাষাই সাহিত্য রচনার উপযুক্ত ভাষা। এভাবেই আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্য তাত্ত্বিকেরা মনে করতেন ছন্দোবদ্ধ ভাষাই সাহিত্য রচনার উপযুক্ত ভাষা। এভাবেই আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্য তাত্ত্বিকেরা মনে করতেন ছন্দোবদ্ধ ভাষাই সাহিত্য রচনার উপযুক্ত ভাষা। এভাবেই আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্য লেখা হয়েছে মূলত মানুষের বিনোদন ও ধর্ম সৃষ্টির প্রয়োজনে। কিন্তু যুগ বদলালো, মানুষের প্রয়োজন বাড়লো। শুধু সাহিত্যিক প্রয়োজন নয় পাশাপাশি ব্যবহারিক প্রয়োজনও বাড়তে থাকলো। শুরু হলো গদ্যের প্রচলন। বাংলার মতো ইংরেজি সাহিত্যেও পদ্যের জন্ম আগে হয়েছে, গদ্য এসেছে পরে। তবে ইংরেজি গদ্যের সাবালক হতে প্রায় চারশ বছর সময় লেগে গেছে। সেখানে বাংলা গদ্য সাবালক হয়েছে দু'শো বছরের মধ্যেই। তাহলে বোঝা যাচ্ছে

আমরা যে সাবলীল বাংলা গদ্যে কথা বলি এর ইতিহাস খুব বেশিদিনের নয়। চর্যাপদ থেকে ১৭৬০ অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের যুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ছিল পদ্যাশ্রিত। কিন্তু ইংরেজদের এদেশে আগমনের পর প্রতিদিনের কাজকর্ম আইন-আদালতের কাজের জন্য গদ্যভাষা চর্চা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে অষ্টাদশ শতকে আমাদের দেশে পর্তুগীজ আগমন এবং উনিশ শতকের গোড়ায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা। এরপর থেকেই বাংলা গদ্য তার পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। এর আগে বাংলা গদ্যের লিখিত রূপের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় কতিপয় কিছু কড়চা জাতীয় বৈষ্ণব গ্রন্থ, রাজকার্য সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজ, চিঠিপত্র ও খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রচালিত পুস্তিকায়। সাহিত্য ক্ষেত্রে বাংলা গদ্য সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে উনিশ শতকের প্রারম্ভে। ইংরেজদের ভারতবর্ষে আগমনের পর এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে অনুভূত হয়। কাজকার্য পরিচালনা, খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার, হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, হিন্দু সনাতন আদর্শ রক্ষার তাগিদে এই প্রয়োজন আরও বেশি করে উপলব্ধ হতে থাকে। সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য চালানোর জন্য ও ইংরেজ রাজকর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের প্রয়োজনে এই সময়েই গড়ে ওঠে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। লেখা হয় বাংলা গদ্য নির্ভর পুস্তক। শুরু হয় বাংলা গদ্যের পথ চলা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠী সাধু গদ্যরীতির ব্যবহার করলেও তাঁরা বাংলা গদ্যের যথার্থ সাঁচটি আয়ত্ত করতে পারেননি। তাই, কেউ ফারসি, কেউ বা সংস্কৃত বা ইংরেজি রীতিকে অনুসরণ করেছিলেন। কেউবা অবলম্বন করেছিলেন মুখের ভাষা। এরপরেও বাংলা গদ্য এগিয়ে গেছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। একে একে এসেছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখেরা। রামমোহনের গদ্যে হয়তো সাহিত্য রস ছিল না, কিন্তু তাঁর ভাষা ছিল প্রাঞ্জল। আবার বিদ্যাসাগরের হাতে পড়ে বাংলা গদ্যে এক সার্থক সাহিত্যিক রূপ লাভ করে। এরপর কালীপ্রসঙ্গ সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র। প্যারীচাঁদ মিত্র ব্যবহার করেন এক অন্য ধরনের গদ্য; যেখানে সাধুভাষায় যুক্ত ক্রিয়াপদের বদলে চলিত ধাতুর ব্যবহার। তদ্ভব ও দেশি শব্দের প্রয়োগ, সমাসবদ্ধ পদের পরিবর্জন, ইডিয়মের ব্যবহার। কালীপ্রসন্ন ব্যবহার করলেন কথ্যভাষা। পরে বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যকে করে তুললেন ভাব ও রসের বাহন। এরও পরে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বাংলা গদ্য পরিশীলিত ও বৈচিত্র্য লাভ করল। এভাবে বাংলা গদ্যকে জানতে হলে, বাংলা গদ্যের শৈলীর ক্রমবিবর্তন বুঝতে হলে এই অধ্যায়টি পাঠ করা জরুরি।

একক ১ ❑ বিদ্যায়তনিক চর্চায় বাংলা গদ্যের প্রয়োজনীয়তা

অ্যাকাডেমিক গদ্য রচনার সোপান হিসাবে আমরা উইলিয়াম কেরি ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের নামই সর্বাগ্রে বলতে পারি; যদিও নন-অ্যাকাডেমিক গদ্য রচনা শুরু হয়েছিল তারও দু'শ বছর আগে। বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ, কুলজি গ্রন্থ, বৈষ্ণব কারিকায় সেই গদ্যের দৃষ্টান্ত পেয়ে থাকি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হবে ১৫৫৫ সালের কথা। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ অহম হাজাকে বাংলা গদ্যে চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিটি অহমের 'বন্তি' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। যদিও সে ভাষা ছিল গুরুচণ্ডালী দোষাক্রান্ত। তবু বাংলা গদ্যের প্রারম্ভিক লগ্নে এর গুরুত্বকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কেরি পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যের আভাস আরও দু জায়গায় পাওয়া যায়, তা হলো মনো এল দা অস্‌সুম্পসাম রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও দোম আন্তেনিও রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থ দুটির মধ্য দিয়ে। ১৭৩৪ সালে লেখা হচ্ছে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম বই। এর হরফ বাংলা ছিল না। এই বইয়ের বাঁদিকের পৃষ্ঠায় রোমান হরফে পর্তুগিজ ভাষার উচ্চারণের পদ্ধতি ক্রমে লিখিত হয়েছিল বাংলা ভাষা। আর এই বইয়ের ডান দিকের পৃষ্ঠা ছিল পর্তুগিজ ভাষায়। এশিয়াটিক সোসাইটিতে এই বইটি সংরক্ষিত আছে। বাংলায় পর্তুগীজ ভাষার কথোপকথন ছলে এটি লিখিত হয়। এরপর লেখা হচ্ছে 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। লিখছেন রাজবংশীয় সন্তান দোম আন্তেনিও। এই দুটি বই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে কারণ এই দিয়েই মুদ্রণ পূর্ব যুগ শুরু হচ্ছে। এরপর ১৭৮৪ সালে হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ লেখা হচ্ছে 'এ গ্রামার অফ বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ'। এই বইটি মুদ্রণের জন্য তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে অনুরোধ করেছিলেন হ্যালহেড। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উইলকিন্স। তিনি নিজের হাতে বাংলা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেছিলেন। এরপরে পঞ্চানন কর্মকার এর কাছ থেকে শিখে নিয়ে ছেনি কাটা বাংলা হরফ তৈরি হতে থাকে। চার্লস উইলকিন্স এই হরফের প্রবর্তক আর পঞ্চানন কর্মকার হলেন এর নির্মাতা। এভাবেই শুরু হতে থাকে বাংলা গদ্যের প্রারম্ভিক চর্চা। পরবর্তীকালে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা বাংলা গদ্য ভাষাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিলেন। এরা নিজেরা বাংলা গদ্য লিখতেন ও মুন্সি পণ্ডিতদের বাংলা গদ্য লিখতে উদ্বুদ্ধ করতেন। সাহিত্যের ঐতিহাসিক সুকুমার সেনের মত অনুযায়ী, প্রাচীন সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার ছিল অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজনে। প্রতিদিনের সংসারের সাহিত্য সৃষ্টির জন্য এর প্রয়োজন ছিল না। ইংরেজ শাসন পত্তনের পর থেকে প্রতিদিনের কাজকর্ম অন্ন-বস্ত্রের ব্যাপারে লেখাপড়ার গুরুত্ব বাড়তে থাকে। রাজস্ব সংগ্রহ দেশশাসনের জন্য আইনের বই লেখা শুরু হয়। শাসনকার্যের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাই বাংলা শেখার প্রয়োজনে কোম্পানি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ খুললেন। সেই কলেজের প্রয়োজনে ও উদ্যোগে বাংলা গদ্য বই লেখা শুরু হল। ইউরোপীয় মিশনারিদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা গদ্যে ধর্মশাস্ত্র প্রচার করা। কোম্পানি ধর্মপ্রচারের জন্য তাদের কোনো উৎসাহ দিত না, বরং এর বিরুদ্ধতা করতো। তাই ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিরা কলকাতায় সেভাবে ঘাঁটি করতে পারেনি। তারা আঠারোশো

খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে একটি মিশন প্রতিষ্টা করেন। এই মিশনের মুখ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন উইলিয়াম কেরি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের দায়িত্বও পেয়েছিলেন পাদ্রি উইলিয়াম কেরি। মিশন থেকে প্রথম মুদ্রিত হয়ে বের হ য় ধর্মগ্রন্থ বিষয়ক বই— বাইবেলের অনুবাদ। কেরির সহায়তায় ও উদ্যোগে ১৮০১ সালে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট ও ওল্ড টেস্টামেন্টের অনুবাদ হয়। কিন্তু উইলিয়াম কেরির বিশেষত্ব হলো এই নিয়েই তিনি তৃপ্ত থাকলেন না, তিনি ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শিক্ষার জন্য বাংলা ব্যাকরণ লিখলেন ১৮০১-এ। এরপর লিখলেন 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা'। যদিও ওই গদ্যগ্রন্থকে যথার্থ গদ্যের বাহন বলা যায় না কারণ তা ছিল বহুদোষযুক্ত। কিন্তু বাংলা গদ্য সূচনা লগ্নের সাহিত্য হিসেবে এর মূল্য অপরিসীম। কারণ সে সময় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কোন নিষ্কাম বিদ্যাচর্চার আসর বসাতে চায়নি; তাদের উদ্দেশ্য ছিল শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারীদের এদেশের মানুষজনের ধরন-ধারণ বোঝানো। আর সে কারণেই দরকার হয়ে পড়েছিল দেশীয় ভাষা শিক্ষার। উইলিয়াম কেরির 'কথোপকথন' তখনকার দেশীয় ভাষার রীতি মেনেই লেখা হয়েছিল। এভাবেই বাংলা গদ্য এগিয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হাত ধরে। এসেছেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, গোলকনাথ শর্মা সহ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকবৃন্দ। রামরাম বসু লিখেছেন 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। আসলে এই গদ্যকারদের কাছে মুখ গুরুত্ব পাচ্ছে বিষয়। বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই তাঁরা যতখানি সম্ভব তাকে অলংকৃত করার চেষ্টা করছেন। তাদের তখনকার নান্দনিকতা বোধ ও এই শতকের সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের নান্দনিক বোধের মধ্যে অনেকটাই ব্যবধান রয়েছে; যা আমরা পরবর্তীকালে বুঝতে পেরেছি। তবে গদ্য রচনার প্রারম্ভিক লগ্নে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিশেষ অবদান রয়েছে।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশে ইউরোপীয় মিশনারি ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা

বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি পর্ব এবং সেই সৃষ্টিতে ফোট' উইলিয়াম কলেজের অবদান এই দুটি বিষয় আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিরোধী ও সম্পর্কহীন বলেই মনে হয়। বস্তুত আমাদের দেশীয় ভাষা সাহিত্য রীতির উদ্ভবে বিদেশি ইউরোপীয়দের অবদান যে থাকতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে এই ভাবনা সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় ব্যাপার। কিন্তু আমরা যদি ঔপনিবেশিক বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের দিকে তাকাই, তাহলে এই দুই পরস্পররিরোধী বিষয়ের মধ্যে একটা সংযোগ সূত্র খুঁজে পাব। একদিকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের তাগিদ আর অন্যদিকে এ দেশের প্রশাসনিক অচলাবস্থা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় বিশেষত ইংরেজরা সরাসরি বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

মার্শম্যান, টমাস, ওয়ার্ড, কেরি প্রমুখ খ্যাতনামা ইংরেজ মিশনারিগণ আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে দিনেমার অধ্যুষিত শ্রীরামপুরে একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল এদেশে খ্রিস্ট ধর্মের প্রসার ঘটানো। এই লক্ষ্যে তারা ইংল্যান্ড থেকে একটি পুরনো মুদ্রাযন্ত্র আনিয়ে এবং পঞ্চানন কর্মকার এর কাছ থেকে বাংলা হরফ তৈরি করে মিশনের মধ্যেই একটা প্রেস গড়ে তোলেন। প্রথম যে বইটি প্রেসে ছাপা

হয়েছিল তা হল নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্গত 'মঙ্গল সমাচার মতিউর রচিত'। আঠারোশো খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বইটি ছাপা হয়েছিল। মিশন প্রেস বাইবেলের অনুবাদ দিয়েই শুরু করেছিল এরপর সেখান থেকে নিউ টেস্টামেন্ট ও ওল্ড টেস্টামেন্টের কিছু অংশ প্রকাশ পায়। ১৮০৯ সালের মধ্যে সমগ্র বাইবেল অনুদিত হয়ে সেখান থেকে প্রকাশ পেয়েছিল। এছাড়া বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ হবার আগে এখান থেকে প্রকাসিত হয়েছিল 'খ্রিস্ট বিবরণামৃতং'। এটি ছিল টমাস কর্তৃক অনুদিত। এইভাবে ধীরে ধীরে শ্রীরামপুর মিশনের পাশাপাশি চলতে থাকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পথ চলা। শ্রীরামপুর মিশনারিদের পর বাংলা গদ্যের সৃষ্টি পর্বের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে। ভারতের শাসনকার্যে জন্য ইংল্যান্ড থেকে আগত রাজকর্মচারীদের ভাষাগত ব্যবধান দূরীকরণের জন্য উইলিয়াম কেরির পরামর্শমতো ওয়েলেসলি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে দেশীয় ভাষা শিক্ষার এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বাভাবিকভাবেই বহুভাষাবিদ কেরি সাহেব এই বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই নতুন কাজে ব্রতী হয়ে তিনি প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সিভিলিয়ান ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য দেশীয় ভাষায় রচিত উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব হয়েছিল প্রধান সমস্যার কারণ। যদিও এই সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রথমেই তিনি তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন দেশীয় পণ্ডিতের সাহায্য নেন। তাদের ওই কলেজে নিযুক্ত করেন এবং মৌখিক বাংলা ভাষায় গদ্য রচনার জন্য তাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। উইলিয়াম কেরি তাঁর সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন বাংলা গদ্য গ্রন্থের দুই লেখক রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে। দুজনের লেখার স্টাইল দু'রকম, তবু বাংলা গদ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই দুই লেখকের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। এরা ছাড়াও রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ, তর্কপঞ্চানন, গোলকনাথ শর্মা, চণ্ডীচরণ মুনশী, তারিণীচরণ মিত্র, হরপ্রসাদ রায় প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। হিতোপদেশের গল্প বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক গোলকনাথ শর্মা। ফারসি তোতা কাহিনির হিন্দুস্থানী অনুবাদ 'তোতা কহানী' অবলম্বনে চণ্ডীচরণ মুনশী লেখেন 'তোতা ইতিহাস'। ছাত্রপাঠ্য বই হলেও বইটির গল্পরসের চাহিদা কম ছিল না। বিদ্যাপতি রচিত সংস্কৃত 'পুরুষ পরীক্ষা'কে বাংলায় অনুবাদ করেন হরপ্রসাদ রায়। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচনা করেন 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫)। ভাষা যুগের তুলনায় স্বচ্ছ। তবে পাণ্ডিত্য ও উৎকৃষ্টতা বিচারে রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নামই সর্বাগ্রে উঠে আসে। আর কেরি ছিলেন তাদের তত্ত্বাবধায়ক এবং সহযোদ্ধা।

রামরাম বসু :

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামরাম বসু; স্ববিরোধিতার এক মূর্ত প্রতীক। মুখে তিনি ইংরেজদের স্তুতি গাইলেও কখনোই তিনি স্বধর্ম ভ্রষ্ট হননি। তাঁর রচিত গ্রন্থ দুটি হলো 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) ও 'লিপিমালা' (১৮০২)।

বিদেশি ছাত্রদের জন্য রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রথম মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। এই গদ্যগ্রন্থটির বিষয়বস্তু বিভিন্ন ফারসি গ্রন্থ ও কিংবদন্তি থেকে সংকলিত। গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবন ইতিহাস। সেকালে গালগল্প রচনার যুগে রামরাম বসুর জীবনী রচনা প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনব। তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে লেখা চিঠিপত্রের সংকলন হল লিপিমালা। পত্রের আকারে এখানে নানা পৌরাণিক, অলৌকিক কাহিনি বিবৃত হয়েছে। এমনকি চৈতন্যদেবের জীবনকথাও এখানে স্থান পেয়েছে।

রামরাম বসুর প্রথম গ্রন্থটিতে আরবি-ফারসি বাহুল্য এবং অন্বয়গত পারম্পর্যহীনতা পাঠক সাধারণের কাছে পীড়াদায়ক হলেও তার পরবর্তী গ্রন্থ 'লিপিমালা' সেদোষ থেকে অনেকাংশেই মুক্ত। রামরাম বসুর গদ্যরীতি মূলত সেকালের দলিল-দস্তাবেজের গদ্যরূপ। তা সত্ত্বেও বসুজার রচনা স্থানে স্থানে বেশ গতিময় ও সহজবোধ্য। এই রচনায় লেখকের ভাষা বেশ চিত্রময়। একজন রূপ দক্ষ শিল্পীর মতো শিশুসুলভ কৌতুহল নিয়ে তিনি এখানে এমন কিছু কিছু খণ্ডচিত্রের অবতারণা ঘটিয়েছেন, যা আমাদের নিত্য পরিচিত ও খুবই অন্তরঙ্গ। দেখবার ও দেখাবার এই জাতীয় নতুন রীতি রামরাম বসুর মাধ্যমেই আমরা প্রথম দেখতে পাই। এ যেন বঙ্কিমী গদ্যেরই সার্থক পূর্ব সূচনা।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার :

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বঙ্গীয় লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে মাসিক ২০০ টাকা বেতনে তিনি বাংলা ভাষার পণ্ডিত হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি সর্বমোট পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলি হল 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'রাজাবলি' (১৮০৮) 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮১৩), এবং 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' (১৮১৭)। প্রাক্ বিদ্যাসাগর পর্বে বাংলা গদ্যের সৃষ্টি পর্বের যথার্থ কথাশিল্পী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। 'বত্রিশ সিংহাসন' এর বিষয়বস্তু মোট বত্রিশটি পুত্তলিকার মাধ্যমে লেখক উপস্থাপিত করেছেন। লৌকিক ও অলৌকিক চেতনার মিশ্রণে সৃষ্ট এই গ্রন্থের কাহিনি বিন্যাসে সংস্কৃত ভাষার প্রতি আনুগত্য রক্ষা করতে গিয়ে কখনো কখনো তার ভাষার গতিময়তা প্রতিভাত হয়েছে। তবে তা সত্ত্বেও কথ্য ভাষার গ্রাম্যতা থেকে মুক্ত করে বাংলা গদ্যকে বলিষ্ঠ করার একটা প্রয়াস এই গ্রন্থের আগোগোড়া প্রতিভাত।

হিতোপদেশ, প্রবোধচন্দ্রিকা গ্রন্থ দুটিতেই অধ্যাত্মতত্ত্ব, নীতিকথা প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে আবার মৃত্যুঞ্জয়ের ভোগবাদী জীবন-দর্শনের পরিচয়ও মাঝে মাঝে উদ্ভাসিত হয়েছে। 'রাজাবলী' গ্রন্থটি কলির সূচনা থেকে ইংরেজি অধিকার পর্যন্ত ভারতীয় রাজা এবং সম্রাটদের ধারাবাহিক ইতিহাসের সংকলন। এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' গ্রন্থটি রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থের প্রতিবাদ। এই গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের দার্শনিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নিদর্শন পাওয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয়ের বাষা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংস্কৃত অনুসারী ও দুর্বোধ্য হলেও সাধারণভাবে গদ্যভাষা নির্মাণে তিনি অনবদ্য সরসতার পরিচয় দিয়েছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের কোন রচনায় মৌলিক নয় সবই অনুবাদমূলক। যদিও তার অনুদিত গ্রন্থগুলো পাঠ্যপুস্তক এর সীমানা ছাড়িয়ে কখনো কখনো অনুবাদ সাহিত্যের পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছে। একথা বলা যায় প্রাক্

বিদ্যাসাগর পর্বের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচয়িতা হলেন তিনি। প্রবোধ চন্দিকা মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা বলা হয়। বইটি লোকজীবন আশ্রিত গল্পের সংকলন, ভাষাও কৃত্রিমতা বর্জিত। সেকালের পক্ষে এটা একটা বড়ো গুণ বইটি দীর্ঘদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল।

উইলিয়াম কেরি :

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আলোচনা প্রসঙ্গে যে নামটি বিশেষভাবে উঠে আসে তিনি হলেন উইলিয়াম কেরি। এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সংকল্প নিয়েই তিনি ১৭৩৯ অব্দে কলকাতায় এসেছিলেন। কেরির প্রধান সহযোগী ছিলেন টমাস যিনি কেরিকে বাংলাদেশে আনতে আগ্রহী করে তুলেছিলেন। আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জোশুয়া মার্শম্যানের সহযোগিতায় জানুয়ারি মাসে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন স্থাপিত হয়। এর পাশাপাশি উইলিয়াম কেরি নিউ টেস্টামেন্ট, ওল্ড টেস্টামেন্টের অনুবাদ করেছেন। তিনি লিখেছেন 'কথোপকথন' (১৮০১) ও 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য লিখেছেন ব্যাকরণ গ্রন্থ 'A Grammar of Bengali language' (১৮০১) এবং বাংলা ইংরেজি অভিধান। এই সময় তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা শিক্ষক হয়ে বুঝেছিলেন সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ করে তুলতে হলে প্রথম প্রয়োজন বাংলা ব্যাকরণ জানা, তারপর গদ্য রচনা। আর এই ভাবনা থেকেই কেরি এগিয়ে চলেন। যদিও কেরির 'কথোপকথন' তাঁর নিজের রচিত গ্রন্থ নাকি তিনি এটি সংকলন করেছিলেন এই নিয়ে মতবিরোধ আছে। তবু এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, কেরির সঙ্গে বাংলা গদ্যের এক আত্মিক যোগ আছে। শুধু তাই নয়, সেকালের বাংলা গদ্যকে যথার্থ রূপদানের জন্য কেরির ভূমিকা অসামান্য। একজন বিদেশি হয়েও উইলিয়াম কেরি বাংলা গদ্যের উন্মেষ পর্বে যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের শিক্ষার্থে বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ ধারায় 'কথোপকথন'-এর গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এখানে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণি ও বিভিন্ন অঞ্চলের স্ত্রী পুরুষদের কথ্যভাষার অত্যন্ত সাবলীল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। কথোপকথনের বাক্যালাপের মধ্য দিয়ে বাঙালি সমাজের আটপৌরে চেহারাটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি বাঙালি সমাজ ও জীবনের যে বাস্তব চিত্র আমরা পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি, তারই সার্থক পূর্বাভাস কেরী সাহেবের এই গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে।

উইলিয়াম কেরির অপর গ্রন্থটি হল 'ইতিহাসমালা'। ইতিহাস অপেক্ষা এখানে অলৌকিক গল্পের প্রাধান্যই বেশি লক্ষ করা যায়। বাংলার সমৃদ্ধ লৌকিক কাহিনির ভাণ্ডার থেকে তিনি অনেক কাহিনি এখানে গ্রহণ করেছেন। এমনকি চণ্ডীমঙ্গলের গল্পও এখানে স্থান পেয়েছে। ইতিহাসমালার ভাষা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রাথমিক যুগের ভাষা অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল এবং গদ্য রচনার একটা স্বতন্ত্র স্টাইল এর মধ্যে দেখা যায়। প্রসঙ্গত বলা যায় কি সম্ভবত এই গদ্য রচনায় সম্পাদক ও সংকলক এর ভূমিকা পালন করেছিলেন উইলিয়াম কেরি। এইভাবে নিজে সৃষ্টি করে অন্যকে সৃষ্টিকর্মে প্রাণিত করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্ণধার হিসেবে উইলিয়াম কেরি বাংলা গদ্যের প্রস্তুতি পর্বে এক মহতী ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন।

একক ২ ❑ উনিশ শতকের গদ্য চর্চায় বাংলা সাময়িক পত্র

মিশনারিদের ধর্মীয় প্রচার আর বিদেশি সিভিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষার পাঠ দেওয়ার পাশাপাশি, দেশ-কাল-সমাজের সমকালীনতা ও ঔৎসুক্য বিভিন্ন রচনা বা সাময়িকপত্রের পাতায় ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস থেকেই বাংলা গদ্য সাহিত্য ধারাবাহিকতা পেয়েছে একথা বলা যেতে পারে। যে জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাবনা-বিশ্ব ও যুক্তিবোধ, যে পরিশীলন ও মননশীলতায় গদ্যসাহিত্যের চর্চা ও বিকাশের পথ অনুকূল হয়, সেসবের প্রভাব বিদেশি শাসন ও পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শনগত সংস্পর্শের আগে বাঙালির কাছে সম্ভব পর হয়ে ওঠেনি। বিদেশি শাসনের সেই পর্বে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত অনেক বাঙালির কাছেই সেদিন খুলে গিয়েছিল ইউরোপীয়, বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য-দর্শন ও ভাবনা-চেতনার বিশাল ভাণ্ডার। সেসবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বাঙালির চেতনাজগতের সঙ্গেই সেই সময়ের সমাজ-সাহিত্যকেও আমূল বদলে দিয়েছিল। এজন্যই হয়তো অনেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই পর্বকে নবজাগরণের কাল হিসেবে লক্ষ্য করতে চেয়েছেন। উনিশ শতকের বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের যথার্থ পরিচয় পেতে হলে সাময়িক পত্রের কথা উল্লেখ করতেই হবে। সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে বাংলা সাময়িকপত্র সেই সময় জনমানসে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। শুধু তাই নয় মানুষের চিন্তার জগতেও সংবাদপত্রগুলি সেই সময় বিশেষ ছাপ রেখে যায়। উনিশ শতকের প্রারম্ভে শ্রীরামপুর মিশনারিদের দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন যেমন বাংলা গদ্য রচনায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল ঠিক তেমনি মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন বাংলা সাময়িক পত্রের ক্রমবিকাশেও সাহায্য করেছিল। এ বিষয়ে প্রথম উল্লেখ করতে হয় 'দিগদর্শন' সাময়িক পত্রের কথা। শ্রীরামপুরের মিশনারি দ্বারা প্রবর্তিত এই পত্রিকা ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রিকা হিসেবে 'দিগদর্শন' সেইসময় বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল। এটি মূলত ছিলো শিক্ষার্থীদের উপযোগী। যদিও এই পত্রিকা হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে নানাভাবে আক্রান্ত করেছিল। এরপর মিশনারিদের উদ্যোগেই প্রকাশিত হয় সমাচার দর্পণ। ১৮১৮তে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি ছিল বাংলা ভাষার প্রথম সাপ্তাহিক পত্র। এখানেও হিন্দু ধর্মের প্রতি উদারতা দেখানো হয়নি। যদিও সেটুকু বাদ দিলে এই পত্রিকার কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। দিগদর্শন পত্রিকাটি শুধু বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসেই নয়, তৎকালীন শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল। মিশনারিদের উদ্যোগে পত্রপত্রিকা বের হতে শুরু করলেও সেই পত্রিকাগুলির হিন্দু ধর্মের প্রতি উগ্র বিরোধিতা রামমোহন মেনে নেননি। আর তাই এর বিরোধিতা করে হিন্দুধর্মের পক্ষ নিয়ে রামমোহন বের করেন 'ব্রাহ্মণ সেবধি'। এটি ১৮২১ সালে প্রকাশিত হয়। এটি ছিল মূলত হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে মিশনারীদের অসঙ্গত আক্রমণের বিরোধিতা করা। এরপরেই সংবাদপত্র হিসেবে উল্লেখ করতে হয় 'সম্বাদ কৌমুদী'র কথা। যা রামমোহনের উদ্যোগে প্রকাশিত হতো। এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রামমোহনের প্রগতিমূলক মতবাদের বিরোধিতা করে ভবানীচরণ প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক পত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২)। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদূত'। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর

প্রমুখদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় পত্রিকাটি। সম্পাদক ছিলেন নীলমণি হালদার। এরপরের উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১), যা ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়কালেই প্রকাশিত হয় 'সম্বাদ তিমিরনাশক', 'সর্বতত্ত্বদীপিকা', 'পশ্বাবলী', 'সংবাদ রত্নাবলী', 'বিজ্ঞান সেবধি', 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'সম্বাদ তিমিরনাশক', 'সমাচার সুধাবর্ষণ', 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রভৃতি। পত্রিকাগুলির নাম থেকেই সম্ভবত বোঝা যায় এই সাময়িকপত্রগুলি প্রচারের উদ্দেশ্য কি ছিল? দেশের মানুষকে আলোক দান করাই ছিল এই সংবাদপত্রগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য।

সমাচার চন্দ্রিকা শুধু রামমোহন রায় নয়, মিশনারিদের ইংরেজি শিক্ষারও বিরোধিতা করেছিল। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র বিরোধিতা করে প্রগতি পন্থার অভিমুখী পত্রিকা, নীলরতন হালদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত বঙ্গদূত। ১৮২৯ সালের ১০ই মে এটি প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদূত' নামে এই পত্রিকার পরিচালন সমিতিতে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা যুক্ত ছিলেন। এরপর একের পর এক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে যার মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। ১৮৩১ সালের ২৮শে জানুয়ারি যখন পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এটি ছিল সাপ্তাহিক। এর ঠিক আট বছর পর ১৮৩৯ থেকে পত্রিকাটি দৈনিক হিসেবে প্রকাশ পেতে থাকে। এটি বাংলায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে এই সংবাদপত্রগুলোর নাম বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ বাংলা গদ্য সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারিগর হিসেবে সেই সময় এই সংবাদপত্রগুলি বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছিল। সংবাদ প্রভাকর পরবর্তীকালে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩)। পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত। ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হলেও অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনাগুণে পত্রিকাটি অচিরেই হয়ে ওঠে মুক্ত জ্ঞানচর্চার আধার। উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হল 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'সর্বশুভকরী', 'সোমপ্রকাশ', 'মাসিক পত্রিকা', 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা', 'এডুকেশন গেজেট' ইত্যাদি। পত্রিকার ইতিহাসে এর পরের মাইলস্টোন বঙ্গদর্শন (১৮৭২)। প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে, তা বলাবাহুল্য। কিন্তু যেটা বিশেষভাবে বলবার তা হল এই পত্রিকাগুলি ক্রমশ বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে যায় ওতপ্রোতভাবে। এই পত্রিকাগুলি হয়ে ওঠে বাংলা গদ্য ও বাঙালির মন-মনন চর্চার ধাত্রীভূমি।

একক ৩ ❑ বাংলা গদ্যের বিকাশে রামমোহন রায় ও অক্ষয়কুমার দত্ত

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহন রায়ের বিশেষ অবদান অনস্বীকার্য। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত অনুযায়ী বলা যায়, বাঙালি জাতিকে তিনি মধ্যযুগের গুটি কেটে আধুনিক আকাশে উড়তে শিখিয়েছিলেন। ১৭৭৪ মতান্তরে ১৭৭২ সালে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামের এক সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ঘরে রামমোহনের জন্ম। রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনে চাকুরিরত ছিলেন। বাংলার রাজ সরকারের চাকরি করেই তিনি রায় উপাধি পেয়েছিলেন। একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায়কে দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর 'রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহন রায়ের অবদান অবিস্মরণীয়। বাংলার নবজাগরণের মাধ্যমে যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল তা প্রবলভাবে অনুভূত হয় উনিশ শতকে। এই সময়ে বাঙালিদের একটি গোষ্ঠী ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে বাংলার সার্বিক বিকাশে এগিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা ভারতের অতীত ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এই নবজাগরণের প্রাণপুরুষ ছিলেন রামমোহন রায়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাত ধরে বাংলা গদ্য চর্চা শুরু হলেও রামমোহনের হাতে তা এক দৃঢ় ভিত্তি পায়। তিনি সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে সুশৃঙ্খল রূপ দেওয়ার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। বাংলা গদ্যের সাধু চলিত নিয়ে তিনি পরীক্ষা চালান। সে যুগের বাংলা গদ্য ছিল সংস্কৃত শব্দবহুল। এটি সাধারণ লোকের পক্ষে বোধগম্য হতো না, রামমোহন এর বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁর রচনা সাধারণ লোকের বোধগম্য করতে চেয়েছিলেন। যদিও রামমোহনের রচনা ছিল সংস্কৃত শব্দবহুল ও আড়ষ্ট। তাতে সাহিত্য রসও ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁর গদ্যে যুক্তি, তর্ক, চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়ে তাকে আধুনিক চিন্তাশীল মননের উপযোগী করে তুলেছিলেন। আর তাই আধুনিক যুগের এক বিশিষ্ট বাংলা গদ্য লেখক হিসেবে তাঁর কৃতিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। সংস্কৃত, ফারসি, ইংরেজি জানা সেকালের শিক্ষিতদের অগ্রণী ছিলেন রামমোহন রায়।

রামমোহন রায় ধর্ম সংস্কার করতে গিয়ে বাংলা গদ্যচর্চায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। একেশ্বরবাদের সমর্থন স্বরূপ তিনি বেদান্ত ও উপনিষদ বাংলায় অনুবাদ করেন। রচনাগুলি হল 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫), 'বেদান্ত সার' (১৮১৫), 'কেনোপনিষদ' (১৮১৬), 'ঈশোপনিষদ' (১৮১৬), 'কঠোপনিষদ' (১৮১৭) ইত্যাদি। এই অনুবাদমূলক গ্রন্থগুলি বাংলায় শিক্ষিত সাধারণের জন্য লিখিত বাংলা গদ্য পুস্তক হলেও পুস্তিকাগুলি রচনার জন্য সেসময় সমাজের রক্ষণশীল ব্যক্তিরা রামমোহনের বিরোধিতা করতে থাকেন। বিরোধীদের প্রতিবাদ ছিল অত্যন্ত কটুক্তিপূর্ণ ও মানহানিকর। এসময় রামমোহনের বিপক্ষে সবচেয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। রামমোহনের বেদান্ত ব্যাখ্যার নিন্দে করে মৃত্যুঞ্জয় লিখেছিলেন 'বেদান্তচন্দ্রিকা'। রামমোহনের প্রতিপক্ষরা যুক্তি অপেক্ষা শাস্ত্রেরই দোহাই দিতেন। যুক্তিবাদী হলেও এরকম প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিচারে রামমোহন শাস্ত্রীয় যুক্তিকে নিজের অস্ত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্তচন্দ্রিকা'-র উত্তরে তিনি লেখেন ৬৪ পৃষ্ঠার বই 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭) এছাড়াও রামমোহনের বিরুদ্ধে এসেছিলেন সেকালের রাজবাড়ির গোস্বামীরা। তাদের জবাবে তিনি লেখেন 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮)। এরপর তিনি লেখেন 'কবিতাকারের সহিত বিচার' এবং শেষে লেখেন 'পথ্য প্রদান' (১৮২৩)। যেখানে তিনি কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ড পীড়ন' এর প্রত্যুত্তর দেন। এছাড়াও রামমোহন ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ লেখেন ১৮২৬ সালে; বইটি লেখক কর্তৃক 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩) নামে বাংলা ভাষান্তরিত হয়। বাঙালি রচিত এই প্রথম বাংলা ব্যাকরণ আমরা পেলাম, যেখানে পাই রামমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ মনের ও ভাষাবোধের পরিচয়।

রামমোহন সেকালের সংবাদ পরিচালনায়ও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর পরিচালনায় দু-দুটি বাংলা সংবাদ-সাময়িক পত্র 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১) এবং 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংবাদপত্র প্রকাশ সেকালের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল। সতীদাহ প্রথা নিবারণ এর জন্য তিনি বাংলায় তিনটি ও ইংরেজিতে চারটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বাংলা গ্রন্থগুলি হল 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তক সম্বাদ' (১৮১৮), 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯) এবং 'সহমরণ বিষয়' (১৮২৯)। 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' ছিল তাঁর সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রচিত প্রথম গ্রন্থ। সতীদাহ অশাস্ত্রীয় ও নীতি বিগর্হিত প্রমাণ করার জন্যই তিনি এই পুস্তক রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে রামমোহন দুটি কল্পিত প্রতিপক্ষ খাড়া করে সতীদাহ প্রথার পক্ষপাতী ও এর বিরোধী মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এই পুস্তকটির মধ্যে দিয়ে রামমোহন প্রবর্তকের মাধ্যমে সমাজের রক্ষণশীল গোড়া হিন্দুদের পরাজিত করেছিলেন।

প্রথম জীবনে ঘোরতর ইংরেজদ্বেষী রামমোহন কিশোর বয়সে দেশের সনাতন শিক্ষার ধারা অনুসরণ করে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। আর যে যুগে রামমোহন তাঁর লেখনী ধারণ করেছিলেন সে যুগকে পাশ্চাত্য প্রভাবিত আধুনিক বাংলা গদ্যের অনুকরণ ও প্রতিক্রিয়ার যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সময় এক শ্রেণি পাশ্চাত্য অনুকরণের মোহে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছে, আর অন্য শ্রেণি দাঁড়িয়েছে অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে। রামমোহন রায় এই দুই মনোভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় সাধনে যত্ন নিয়েছিলেন। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। পাশাপাশি যুগের সংকীর্ণ গোঁড়ামি ও অন্যদিকে তাঁর নিজের চিন্তাধারার স্বাধীন প্রকাশ ঘটিয়ে রামমোহন রায় অগ্রগামী পুরুষ হিসেবে ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন। তথাকথিত সাহিত্যিক তিনি ছিলেন না, তবু বাংলা গদ্যের বিকাশে তাঁর অবদান কোনোভাবে ভোলার নয়। রামমোহনের এই অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ মন্তব্য করেছেন, রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট-স্তরের উপর স্থাপন করেছিলেন।

বাংলা গদ্যের বিকাশে অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের প্রধান সহযোগী ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনি ছিলেন একাধারে সাংবাদিক, প্রবন্ধকার ও গবেষক। অক্ষয়কুমার দত্তের লেখায় পাঠক হয়তো তেমন রস মাধুর্য লাভ করতে পারবেন না কিন্তু পাশ্চাত্য প্রথায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রচার করে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান তিনি।

১৮২৯ সালে তিনি প্রথম কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি সেখান থেকে গ্রিক, ল্যাটিন, জার্মান, হিব্রু ভাষার পাঠ নিয়েছিলেন। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর অর্থাভাব তাঁকে স্কুল ছাড়তে বাধ্য করে। স্কুল-কলেজের প্রথাগত শিক্ষা সেভাবে না পেলেও অক্ষয় দত্তের জীবন গড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ ঘরোয়া পদ্ধতিতে। তিনি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখতেন। ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলোকে তিনি বাংলায় অনুবাদ করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নির্দেশমতো সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশের জন্য অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক ইংরেজি সংবাদপত্রের লেখা বাংলায় অনুবাদ হত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংস্পর্শে এসেই তিনি পদ্য রচনায়ও হাত দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম রচনা হলো 'অনঙ্গমোহন কাব্য' (১৮৩৪)। এই রচনাসংগ্রহটি যদিও বিলুপ্ত। তবু মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তিনি যে এই পদ্যময় গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন তা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

অক্ষয়কুমার দত্তের খ্যাতি মূলত তাঁর সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার জন্য। এই মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। পত্রিকাটি ছিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত ব্রাহ্ম সমজের মুখপত্র। শুধুমাত্র অধ্যাত্ম তত্ত্ব কথা নয়, তার পাশাপাশি বিজ্ঞান, দর্শন পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনার বাহন হয়ে উঠেছিল পত্রিকাটি। 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদক হিসেবে তাঁর প্রতিভা বিশেষভাবে স্বীকৃতি পায়। ১৮৪৫৩ থেকে ১৮৫৫ এই বারো বছর তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই সংবাদপত্র সম্পাদনা করেছিলেন। যদিও অক্ষয়কুমার দত্ত সর্বদা দেবেন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট পথে চলেন তবু তাঁর পত্রিকার মধ্য দিয়ে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ প্রচার করতেন। বেদ, বেদান্ত বিজ্ঞান, সমাজ সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য সে যুগে এই পত্রিকাটি বিশেষ সমাদৃত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্ম ধর্মের মূল আদর্শ তাঁর গদ্যের মধ্য দিয়ে প্রচার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্ব দিয়েছিলেন মানবিকতাকে— চারপাশে জগতকে— সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে। তাঁর রচিত 'চারুপাঠ', 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'ধর্মনীতি' ইত্যাদি সেকালে লোকশিক্ষার বাহনরূপে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনী ছাড়াও অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর সম্পাদনায় 'বিদ্যাদর্শন' নামে একটি পত্রিকা বের করতেন সেখানে মূলত বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাই প্রকাশিত হত।

অক্ষয়কুমার দত্তের শ্রেষ্ঠ রচনা হল 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'। দুটি খণ্ডে এটি প্রকাশিত হয় ১৮৭০ ও ১৮৮৩তে। অক্ষয়কুমার দত্তের সারা জীবনের সমস্ত ভাবনা চিন্তার ফসল হল এই বইটি।

ভারতীয় দর্শনের বহুমুখীতাকে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি দিয়ে তিনি এই বইতে বিচার করেছিলেন। ১৮৫টি ধর্মসম্প্রদায়ের ভাষা, ধর্ম, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজ বিন্যাস, রাষ্ট্রকাঠামো প্রভৃতির বিবরণ বইয়ের মধ্যে তিনি দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় বিবিধ সম্প্রদায়ের প্রবর্তন ও তাদের আচরণাদিও বিশদে এখানে বিবৃত আছে। এই গ্রন্থের অনেকাংশ প্রথমে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির তৃতীয় ভাগও তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার আগেই লেখকের মৃত্যু হয়। যদিও তাঁর মৃত্যুর পর পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু কিছু অংশ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল।

অক্ষয়কুমার দত্তের অন্যান্য রচনাগুলি হল 'ভূগোল' (১৮৪১) 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (প্রথম ভাগ ১৮৫১, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫২), 'চারুপাঠ' (প্রথম ভাগ ১৮৫৩, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪) প্রভৃতি। চারুপাঠ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে রম্য রচনার সূচনা ঘটে। শুধু তাই নয় শিশু পাঠ্য হিসাবেও সেটি একসময় বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিল। এছাড়াও তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে তিনি বিজ্ঞানকে উনিশ শতকের বাঙালির সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করে তোলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার দত্তের আগে শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তক লিখতে শুরু করেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত সেই পথেই এগিয়ে চলেন। শিশুদের আনন্দ বর্ধনের জন্য বই লেখেন। শুধু তাই নয় প্রাচীন পাঠক্রম বদলে তিনি যুগোপযোগী নতুন পাঠক্রমও চালু করতে চেয়েছিলেন। শিশু জন্ম থেকে বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার পর্ববিন্যাস করেছিলেন। এছাড়া মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন এবং শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞানের ওতপ্রোত যোগসূত্র বুঝিয়ে দেন। বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তিনি প্রথম তৈরি করেন ইংরেজি শব্দের পরিভাষা। তাঁর গদ্য রামমোহনের মতো কাঠখোট্টা নয়, আবার বিদ্যাসাগরের মতো সুললিতও নয়। আসলে তিনি আখ্যান নয়, লিখেছিলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক, গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ। এভাবেই অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নিজের জায়গাটি করে গেছেন।

একক ৪ ❑ বাংলা গদ্যের বিকাশে বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

বাংলা গদ্য সাহিত্যে এক অদ্বিতীয় ভাষাশিল্পী ও শিক্ষাব্রতী হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহনের পথ বেয়ে উনিশ শতকের অনড় সমাজে যুক্তিজ্ঞানের অস্ত্রাঘাত করে এঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামের বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়। বছর আটেক গ্রামের স্কুলে পড়াশোনার পর কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলের মল্লিকের বসতবাটি সংলগ্ন এক প্রাণমারি স্কুলে ঈশ্বরচন্দ্র ভর্তি হন। অসুস্থতার কারণে সেখানে তিনি বেশিদিন থাকতে পারেননি আবার ফিরে যান গ্রামের বাড়িতে। এরপর পুনরায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। ১৮২৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতার সংস্কৃত কলেজে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন। এখানে অল্প দিনের মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্র মেধাবী ছাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। কলেজের ছাত্রজীবন শেষ হবার আগেই তাঁর ধীশক্তির স্মারক হিসাবে সংস্কৃত কলেজ তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৮৪১ সালে বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করার পর বাংলা ভাষার অধ্যাপনার জন্য এই কলেজে যে পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেখানে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজের প্রথম পণ্ডিতের স্থানে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইউরোপীয় কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখানো ছিল প্রধান পণ্ডিতের কাজ। এখানে পাঁচ বছর কাজ করার পর সংস্কৃত কলেজের সহকারি সেক্রেটারির কাজ পেয়ে তিনি এই পদ ছেড়ে দেন। এভাবে তিনি একাধিকবার চাকরি ছেড়েছেন। এরপর ১৮৫১ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদপ্রাপ্ত হন। এই পথে এসেই তিনি নানারকম সংস্কার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। প্রথমেই প্রাচীন সংস্কৃত বইগুলির রক্ষণ ও মুদ্রণের দায়িত্ব নেন। শুধু ব্রাহ্মণ, বৈদ্যই নন সকলের জন্য পড়ার ব্যবস্থা করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের রীতিরও পরিবর্তন করেন। পাশাপাশি সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করেন। বিদ্যাসাগরকে আমরা অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ হিসেবেই জানি, কিন্তু সংস্কৃতের পাশাপাশি ইংরেজিতেও তিনি যে কিরূপ জ্ঞানী ছিলেন, কী সুন্দর ইংরেজি লিখতে পারতেন তা অনেকেরই অজানা।

বাংলা গদ্য সাহিত্য ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরে অবদান বড়ো কম নয়। বাংলা গদ্যকে একটা নিজস্ব রূপ দেওয়ার তিনি চেষ্টা করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বাংলা গদ্যের মাধুর্য ও গাম্ভীর্য। বিদ্যাসাগরের রচনা সমূহকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়—১ অনুবাদ ও অনুবাদমূলক রচনা, ২ শিক্ষামূলক রচনা, ৩ সংস্কারমূলক রচনা, ৪ মৌলিক রচনা, ৫ বেনামী রচনা। অনুবাদক যদি সৃজনশীল হন তাহলে তাঁর কর্মের ক্ষেত্রেও মৌলিকত্বের ছাপ পড়ে। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। তাঁর সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থগুলো ছিল হিন্দি, ইংরেজি ও সংস্কৃতের অনুবাদ। অনুবাদের মধ্য দিয়ে তিনিই প্রথম কথা

সাহিত্যের ভাষা নির্মাণ করেছিলেন। অনুবাদ জাতীয় রচনার মধ্যে তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি'। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে। এটি হিন্দি 'বেতাল পচ্চসী'র বাংলা অনুবাদ নয়; এর ভাষান্তর। বেতাল সেইসময় বঙ্গ সাহিত্যে এক নবযুগের সূত্রপাত করেছিল। বেতালের ভাষা ও সাহিত্য গুণ প্রশংসিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের ধ্বনিময়তা বেতালের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। এরপর লেখা হয় কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর বাংলা অনুবাদ 'শকুন্তলা' (১৮৫৪)। মূলের সাতটি অঙ্ক এখানে সাতটি পরিচ্ছেদের রূপ নিয়েছিল। শকুন্তলার মাধ্যমে বাঙালি পাঠক সমাজের অনেকেরই কালিদাসের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সামান্য কিছু জায়গায় গ্রহণ বর্জন করে শকুন্তলা স্বচ্ছ ও রসবাহী হয়ে উঠেছে। কালিদাসকে কোনরকম অবমাননা না করে তিনি যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয়বাহী। সাধুভাষা ও ক্রিয়াপদ থাকা সত্ত্বেও এর ভাষা ছিল চলিত গদ্যের কাছাকাছি। 'শকুন্তলা' বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের ক্রমবিবর্তনের পরিচয়বাহী। এরপর ১৮৬০ সালে ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' ও বাল্মীকির রামায়ণের উত্তরকাণ্ড থেকে লেখা হয় অনুবাদ মূলক রচনা 'সীতার বনবাস'। লঙ্কা বিজয়ের পর রামের পরবর্তী জীবন ও সীতার জীবনের যন্ত্রণাময় পরিসমাপ্তি নিয়েই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের জীবিতকালেই বইটির পঁচিশবার সংস্করণ হয়। এর ভাষা একটু জটিল, সমাসবদ্ধ শব্দের মাত্র বেশি, তবু এই অনুবাদ বহুল প্রশংসিত। নারীদের অন্তরমথিত বেদনা বিদ্যাসাগর মর্ম দিয়ে অনুভব করেছিলেন। যার সার্থক শিল্পরূপ পাওয়া যায় 'সীতার বনবাসে'র মধ্যে। এরপর ১৮৬৯এ শেক্সপীয়রের 'The comedy of errors'এর নির্বাচিত অংশ নিয়ে বাংলায় রচিত হয় গদ্য আখ্যান 'ভ্রান্তিবিলাস'। 'ভ্রান্তিবিলাস' নিছক বিনোদন ও পাঠককে আনন্দদানের জন্যই রচিত হয়েছিল। ইংরেজি কাহিনি থেকে অনুদিত হলেও বাঙালি পাঠকের কাছে তা কখনই বিদেশি বলে মনে হয়নি। আসলে কাহিনিবিন্যাস, চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর আপন শিল্পী সত্ত্বার পরিচয় দিয়ে গেছেন। রূপান্তর করতে গিয়ে এর নাট্যরস কোনো অংশে ক্ষুণ্ণ তো হয়ইনি বরং শেক্সপীরিয় কমিডির থেকে কোনো কোনো জায়গায় এর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর উল্লেখ করতে হয় 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮) এর কথা। মার্শম্যানের 'Outlines of the History of Bengal' এর একাদশ থেকে ঊনবিংশ অধ্যায়কে অবলম্বন করে এটি লেখা হয়। এছাড়াও বিদ্যাসাগর কর্তৃক অনুদিত হয় চেম্বার্সের 'Biography' 'জীবনচরিত' (১৮৪৯) নামে। এইভাবে অনুবাদমূলক রচনাগুলির মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর আপন মৌলিকত্ব ও স্বাধীনতার ছাপ রেখেছেন। পাশাপাশি অনুবাদের মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতিকে বিশ্বজগতের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন। বিদ্যাসাগর দরদি রওয়ার জন্যই তাঁর রচনাগুলির মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সমাজের অন্তঃপুরের তথা ঘরোয়া জীবনে প্রবেশ করতে পেরেছি। সেখানকার সুখ-দুঃখ, ব্যথা বেদনা অর্থাৎ মানব মনের অন্তর্লীন রহস্যের চিত্র বার করে মানুষকে তাঁর নৈতিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্য ও শিল্পকর্ম গভীরভাবে তাঁর জীবন সম্পৃক্ত। আর তাই তাঁর বিচিত্র কর্ম প্রচেষ্টাকে রূপদানের জন্য তাঁকে গ্রন্থ রচনা করতে হয়েছে। শুধু অনুবাদ নয় যুগের প্রয়োজনে ও তাগিদে তাঁকে পাঠ্যপুস্তকও রচনা করতে হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে পাঠক সমাজে যাতে উচ্চাঙ্গের রস পরিবেশন করতে পারেন সেইকথা ভেবেই তিনি লেখেন 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'বোধোদয়' ইত্যাদি। পদের মধ্যে দিয়ে সহজ সরল কথাভাষায় বিবৃতিতে তিনি যে উপস্থাপন কৌশল দেখিয়েছেন তা বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার। বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'। এটি বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন বছরের মেয়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছিল। এটি বাংলা গদ্যে লিখিত শোকগাথা। গ্রন্থটি প্রথম সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল ১৮৯২ সালে। বালিকার মৃত্যুতে বিদ্যাসাগরের শোক যে কিরূপ তা ছোট্ট গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এরপরে উল্লেখ বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'বিদ্যাসাগর চরিত' (১৮৯১)। গ্রন্থটির মাত্র দুটি পরিচ্ছেদ লেখার পরেই বিদ্যাসাগর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বইটি পুত্র নারায়ণচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর চরিত' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থটিতে দুটি পরিচ্ছেদই ছিল। এখানেই শেষ নয় বিদ্যাসাগর বেনামে পাঁচটি রচনা প্রকাশ করেছিলেন। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য ছদ্মনামে তিনি রচনা করেছিলেন 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) এবং 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩)। এই দুটি গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে বিদ্যাসাগর বেনামে তৎকালীন পণ্ডিত তারানাথ তর্ক বাচস্পতিকে বহুবিবাহ রহিত বিষয়ক জবাব দিয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী রচনাও ছদ্মনামে রচিত এর নাম 'ব্রজবিলাস' (১৮৮৫) এখানে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের বিধবাবিবাহ বিরোধী জবাবের প্রতুত্তর দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। এই গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর অতি উচ্চাঙ্গের হাস্যরস সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়াও 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে তিনি লেখেন 'রত্নপরীক্ষা' (১৮৮৬)। যদিও এটি বিদ্যাসাগরের নিজস্ব রচনা কিনা তা নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

এছাড়া উল্লেখ করতে হয় বিদ্যাসাগরের বিতর্কমূলক গ্রন্থগুলো; যা সেসময় সমাজে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই রচনাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' দুটি খণ্ড যা প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালে। শাস্ত্রীয় বচন এর মধ্য দিয়েই বিদ্যাসাগর অত্যন্ত সুকৌশলে আপন বিনয়কে বজায় রেখে নিজে মত প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের রচনার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল তিনি তর্ক বিতর্ক করেছেন নানারকম যুক্তির মধ্য দিয়ে। এছাড়াও বহু বিবাহ বন্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে তিনি রচনা করেছিলেন 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (প্রথম খণ্ড, ১৮৭১)। এই গ্রন্থ লেখার পরেই সংস্কৃত পণ্ডিতরা তাঁর বিরোধিতা করে পাঁচটি বই লিখেছিলেন। বহুবিবাহ শাস্ত্রবিরোধী নয়, শাস্ত্র অনুমোদিত এই ছিল সেই বইগুলোর প্রতিপাদ্য বিষয়। বিদ্যাসাগরও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা সহকারে এই পাঁচজন পণ্ডিতের জবাব

দিয়েছিলেন তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'বহুবিবাহ রহিত উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৭৩) এর মধ্য দিয়ে। এভাবে যুক্তিতর্কের বেড়াজালে বিদ্যাসাগর সর্বক্ষেত্রে নিজের বক্তব্যকে শক্ত ভিত্তি ভূমির উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর শুধু বাংলা গদ্যের বাহক নন, ধারক হয়েও রয়ে গেছেন আমাদের মধ্যে। তিনি হয়ে উঠেছেন বাংলা গদ্যের যথার্থ শিল্পী। বিদ্যাসাগর এর পূর্বে বাংলা গদ্য নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললেও বাংলা গদ্যকে তার জটিলতা, আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত করে এক মৌল পথ দিয়েছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন 'বিদ্যাসাগরের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই।' এর পাশাপাশি এও বলতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা বিদ্যাসাগরের অনেক রচনা সমালোচিতও হয়েছিল। তবে বিদ্যাসাগর বুঝিয়েছিলেন ভাষা কেবল ভাবের বাহন মাত্র নয়; যে কোন উপায়ে বক্তব্য প্রতিস্থাপন করলেই ভাষার কর্তব্য পূরণ হয় না। নিজের বক্তব্যকে সহজ সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে ব্যক্ত করাই ভাষার কাজ। সেভাবেই তিনি এগিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংহত করিয়া তাহাকে কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।" আর এভাবেই বাংলা গদ্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন বিদ্যাসাগর।

একক ৫ ❑ বাংলা গদ্যের বিকাশে ইতিহাসে প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) ও কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)

উনিশ শতকে বাংলা গদ্যকারদের মধ্যে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক'। বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র অমর হয়ে আছেন তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) রচনার জন্য। এছাড়া তিনি লিখেছেন আরও বহু গ্রন্থ। প্যারীচাঁদ মিত্রের অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১), 'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত' (১৮৭৮), 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৯), 'বামাতোষিণী' (১৮৮১)র মত গ্রন্থাবলী। এছাড়াও ইংরেজি প্রবন্ধাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'The Zamindar and the Ryot' (১৮৫৫), 'Marriage of Hindu Widows' (১৮৫৫), 'The Development of Female Mind in India' (১৮৭২)।

নবজাগরণের প্রারম্ভিক লগ্নে প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম। যে দেশকালে বেড়ে উঠেছিলেন, সেখানে দেখেছেন ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের দাপট পাশাপাশি মানুষের প্রগতিশীল চিন্তা ও উদার মানবতাবাদী দর্শন। এই যুগস্রোতে বাংলা সমাজ যখন ক্ষতবিক্ষত, গতিচঞ্চল সেই সময় প্যারীচাঁদের আবির্ভাব ও তাঁর মানসলোকে উদারতাবাদী চিন্তা নবজাগরণের সদর্থক হিসেবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। তাই সমস্ত রকম সামাজিক নিয়ম নীতির বিরুদ্ধে তাঁর তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। প্যারীচরণ সরকার প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। মদ্যপানের শোচনীয় পরিস্থিতির কথা তিনি তুলে ধরেছিলেন 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়' রচনাটির মধ্য দিয়ে। এই সামাজিক নকশার মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে তিনি এদেশের মানুষদের সতর্ক করতে চেয়েছিলেন। 'মদ খাওয়া বড় দায়', জাত থাকার কি উপায়' গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে সমকালীন সমাজকে তিনি যেভাবে ধরতে চেয়েছিলেন তা হয়তো সে যুগে দাঁড়িয়ে আর কেউই পারেননি।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'ও বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার। প্যারীচাঁদ মিত্র নিজেই এই বইয়ের ভূমিকায় বলেছিলেন 'original novel in Bengali'. বাংলায় যাকে উপন্যাস বলা হয়, তাই। যদিও এ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা বিতর্ক আছে। কেউ একে নকশা কেউ বা অলীক কল্পনা, কেউ বা গল্প বলতে চান। কিন্তু সেইসব বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে একটা কথাই বলতে হবে, আলাল সে যুগের সমাজে বিশেষ ছাপ ফেলে যায় প্রধানত তার ভাষার জন্য। আলালের ঘরের দুলাল আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন— "আলালের প্রতিবেশ পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল, জীবনের নানামুখীনতাকে অবলম্বন করিয়া রচিত। ইহাতে কেবল রাস্তাঘাটের কর্মব্যস্ততা ও সজীব চাঞ্চল্য নাই।

আছে পারিবারিক জীবনের শান্ত ও দৃঢ়মূল কেন্দ্রিকতা।" 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনাটির মধ্য দিয়ে গ্রন্থকার নায়ক মতিলালকে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তার মধ্য দিয়ে সমকালীন জীবনের বহুমাত্রিক সমস্যা শিল্পরূপ পেয়েছে। বাবুরাম বাবুর বড়ো ছেলে মতিলালের চারিত্রিক ভ্রষ্টতা দেখিয়ে দেয় উনিশ শতকের কলকাতা কীভাবে বড়োলোকের সন্তানদের কুসঙ্গে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে মানব জীবন কীভাবে বিপন্ন হয় আলালের ঘরের দুলাল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্যারীচাঁদ মিত্র মানুষকে নয় মানুষের ধর্মকে খুঁজে বার করতে চেয়েছিলেন আর এখানেই তাঁর সাফল্য। মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ কীভাবে সে সময় মানুষকে গ্রাস করে ফেলেছিল আলালের মধ্যে দিয়ে প্যারীচাঁদ সেই ধনী গৃহস্থ সন্তানদের চারিত্রিক অধঃপতন দেখিয়েছেন বাস্তবোচিত যুক্তি পরম্পরায়। আর এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। এছাড়াও এই রচনাটির বিশেষ প্রশংসার দাবিদার কারণ সে যুগে গদ্যে মৌখিক রচনার চেষ্টা তখনো তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। চলছিল বিদেশি বা সংস্কৃত সাহিত্য থেকে অনুবাদ। সে যুগে দাঁড়িয়ে প্যারীচাঁদ এমন এক সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন যা ভাষার ভঙ্গিতে মাইলস্টোন হয়ে রয়েছে। প্যারীচাঁদের এই গদ্য সেইসময় বিশেষ ছাপ রেখে যায়, বলা যায় একটা ঘরানার জন্ম দেয়। প্যারীচাঁদ পূর্ববর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত মূলত সংস্কৃত অনুসারী বাংলা গদ্যকে তাঁদের লেখার বাহন করে নিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদের মতো করে একে সহজবোধ্য করেছিলেন কিন্তু তাঁদের নিজেদের রচনায় কখনোই লোকজীবনের কথ্যভাষা ব্যবহৃত হয়নি। প্যারীচাঁদ মিত্রই প্রথম ভাষাকে শৃঙ্খল মুক্ত করেন। বাংলা ভাষাকে সহজবোধ্য করেন পাঠকের দরবারে। এই কারণেই 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা ভাষায় চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছে। এখানে ব্যবহৃত প্যারীচাঁদের নতুন ভাষা 'আলালী ভাষা' রূপে সমাদৃত থেকেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বঙ্কিমচন্দ্রও এই ভাষাকেই সাহিত্য রচনায় উপযুক্ত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন সেই ভাষার মধ্যে হয়তো গাম্ভীর্য ও বিশুদ্ধতার অভাব আছে, কিন্তু সর্বজনমধ্যে কথিত ও প্রচলিত থাকার জন্য এই ভাষা স্বীকৃত। আর তাই এই ভাষা আলালী ভাষা নামে পরিচিত পায়।

প্যারীচাঁদের পরবর্তী রচনাগুলোর মধ্য দিয়ে তাঁর আধ্যাত্ম চেতনা ও প্রেততাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে। অনেকে বলে থাকেন ১৮৬০ সালে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্ত্রীর মৃত্যুই তাঁর এই মানস পরিবর্তনের কারণ। এই পর্যায়ে তিনি 'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১) 'আধ্যাত্মিক' (১৮৮১) 'অভেদী' (১৮৭১) 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫) প্রভৃতি রচনাগুলি লেখেন। 'গীতাঙ্কুর' এর গানগুলি আধ্যাত্মিক চেতনার পরিস্ফূরণ। 'যৎকিঞ্চিৎ', 'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকা' এই রচনাগুলো ঈশ্বরিক চেতনায় মুখরিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক আগ্রাসন উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থাকে কীভাবে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, তা যেমন প্যারীচাঁদের ব্যাঙ্গাত্মক লেখাগুলির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তেমনই নারীসমাজের উন্নতির জন্য তিনি নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন। বাঙালি নারী সমাজের পারিবারিক, নৈতিক উৎকর্ষের জন্য তাঁর সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছিল। উনিশ শতকের ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন : 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশে প্যারীচাঁদ এবং তাঁহার সহযোগী রাধানাথ সিকদারের দুঃসাহসিকতা আজও আমাদের

বিস্ময়ের বিষয়।... সংস্কৃতের কঠিন শৃঙ্খল হইতে প্যারীচাঁদ বাংলা ভাষাকে মুক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন বলিয়াই সাধু ও চলিত, এই দুই রীতির সংমিশ্রণে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের বাহনস্বরূপ এই গতিশীল ভাষার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।"

বাল্যবিবাহের বিরোধী হয়ে ও বহুবিবাহের বিপক্ষে থেকে প্যারীচাঁদ মিত্র মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন নারী সমাজের সামগ্রিক উন্নতি। এই কারণে নারী বিষয়ে গ্রন্থ রচনার পথিকৃৎ থেকে তিনি নারী সমাজের উন্নতিকল্পে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। নারী সমাজের প্রতি বিশেষ আগ্রহ জন্যই প্যারীচাঁদ মিত্র 'রামারঞ্জিকা', 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা', 'বামাতোষিণী' ইত্যাদি গ্রন্থাবলী লেখেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্যারীচাঁদ মিত্র বলেছিলেন একজন সুশিক্ষিত মা-ই হলেন সন্তানের প্রকৃত শিক্ষক। 'মাসিক পত্রিকা' ছাড়াও মাত্র পনেরো বছর বয়সে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর অন্যতম সাংবাদিক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। সেই অল্প বয়স থেকেই তিনি জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে লিখতেন। এভাবে প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর নিজের কর্মকাণ্ড বলে বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে এক নিজস্ব আসন অধিকার করে গেছেন।

বাংলা গদ্যের বিকাশে কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে কালীপ্রসন্ন সিংহ এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে জোড়াসাঁকোর এক ধনী পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। মাত্র ছয় বছর বয়সে পিতৃহারা কালীপ্রসন্ন প্রতিবেশীর সহায়তায় তাঁর পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যান। আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। এরপর ১৮৫৩ সালে তিনি গড়ে তোলেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'। ১৮৫৫ সালে তিনি ওই সভার মুখপত্র 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র সম্পাদক হয়েছিলেন। শুধু 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' নয়, কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে প্রকাশ পেয়েছিল 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' নামে মাসিক পত্র, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'পরিদর্শক' প্রভৃতি পত্রিকা। কিছুকালের জন্য তিনি এই সব পত্রিকা সম্পাদনাও করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বল্পায়ু ছিলে কিন্তু তাঁর স্বল্পায়ু জীবনেই তিনি নাগরিক সমাজের নানা রকমের ক্রিয়াকর্ম, বিদ্যাচর্চা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলেছিলেন। পাশাপাশি তিনি লেখেন 'বাবু নাটক' (১৮৫৪), 'বিক্রমোর্বশী নাটক' (১৮৫৭), 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' (১৮৫৮), 'মালতীমাধব নাটক' (১৮৫৯) এবং 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২)। এছাড়া তাঁর মহাভারতের অনুবাদ ও তা বিনামূল্যে জনসমাজে প্রবল প্রভাব ফেলেছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহের পরিচিতি মূলত তাঁর নকশা ধর্মী রচনা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র জন্য। উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ শাখার সৃষ্টি হয়েছিল যার মধ্য দিয়ে সমকালীন নানা সমস্যা ও সেই সামাজিক বিকৃতি পরিবেশিত হত। ১৮২১এ 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় 'বাবুর উপাখ্যান' দিয়ে যার সূচনা হয়েছিল। এরপর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫) 'দূতীবিলাস' (১৮২৫), রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখছেন 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮),

মধুসূদন দত্ত লিখছেন 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। এদের মধ্য থেকেই কিছুটা আলাদা হয়ে প্রকাশিত হয়েছে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২)। কালীপ্রসন্ন সিংহই প্রথম ব্যঙ্গমূলক সমাজচিত্র রচনায় নকশা কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। স্কেচ বা নকশার মধ্যে বাস্তবের অনুকরণ রয়েছে। টুকরো টুকরো বাস্তব চিত্র নির্মাণ করে নকশাকার সমাজের বহু ঘটনার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করাতে চেয়েছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ ব্যক্তিগত জীবনে শুধুমাত্র যে কদাচার ও অশ্লীলতার ঘোর বিরোধী ছিলেন তাই নয় সমস্ত প্রগতিশীল সমাজ সংস্কার আন্দোলনেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন। আর তাই তাঁর হুতোম প্যাঁচার নকশার মধ্য দিয়ে সমাজের সমস্ত রকম কুপ্রথা ও দুর্নীতির উপর কশাঘাত এনেছিলেন। হুতোমের এই লেখা মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজের অচলায়তনে ফাটল ধরিয়েছিল। প্রথাজীর্ণ, অবসাদগ্রস্ত, বিধি-নিষেধ সংস্কারসর্বস্ব মানুষকে সচেতন করার জন্যই কালীপ্রসন্ন তাঁর হাতের মসিকে অসি রূপে গ্রহণ করেছিলেন। হুজুগ, বুজরুকি ও কুসংস্কার কীভাবে মানুষের মনে দানা পাকিয়ে ছিল, তা হুতোম প্যাঁচার নকশার প্রবন্ধগুলি পাঠ করলেই অনুমান করা যাবে। কালীপ্রসন্ন সিংহ দেশের সেইসব মূঢ়তা, ভণ্ডামি, ইত্‌রামি একেবারে ফটোগ্রাফিক বাস্তবতায় তুলে ধরেছিলেন।

কালীপ্রসন্ন সম্পর্কে আরেকটি কথা না বললেই নয় তাহল তাঁর সৃষ্ট গদ্যের ভাষা। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বাংলা গদ্যের যে দুটি রূপ চলে এসেছে একটি সাহিত্যিক সাধু ভাষা ও সাহিত্যিক চলিত ভাষা। কালীপ্রসন্ন পূর্ববর্তী কেউই অবিকল মুখের ভাষায় গদ্য রচনা করেননি। সেক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন পুরোপুরিভাবে মানুষের মুখের ভাষাকে অনুসরণ করে হুতোম প্যাঁচার নকশা লিখেছিলেন। শুধু তাই নয় বানানের ক্ষেত্রেও তিনি পুরনো সমস্ত ধারণাকে ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছিলেন। পাশাপাশি পুরাতন গদ্যরীতি অর্থাৎ কর্তা ক্রিয়াকর্মের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। কখনো বা হুতোম পেঁচায় উদ্দেশ্য বিধেয়র পরিবর্তন ঘটেছে। এই কারণেই উনিশ শতকে কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নকশার ভাষা 'হুতোমী ভাষা' নামে স্বীকৃতি পেয়েছে। কেউ কেউ হয়তো হুতোমী ভাষাকে অশালীন বলে মনে করেছেন। বলেছেন হুতোমী ভাষা রঙ্গ-ব্যঙ্গ রচনার উপযুক্ত হলেও চিন্তাশীল সিরিয়াস ধরনের গদ্য রচনা উপযুক্ত নয়। কিন্তু প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে দেখা যাবে এখানে ভাষার সিরিয়াস দিকেরও সন্ধান মিলেছে। শিক্ষক যেমন অমনোযোগী ছাত্রের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না, ডাক্তার যেমন পীড়িতা গণিকার চিকিৎসা করতে বাধ্য থাকেন, ঠিক তেমনি হুতোম সমাজের বিকৃতি সংশোধনের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই সামাজিক নকশা আঁকতে বসেছিলেন। পিউরিটান মনোভাব নিয়ে সমাজের এই নৈতিক অধঃপতনের দিকগুলো এড়িয়ে গেলে এই ধরনের সাহিত্য উঠে আসত না, শুধু তাই নয় মানুষ তাঁদের সচেতনতা থেকে বঞ্চিত হত। তাই শ্লীলতার মাত্রা গণনা না করে কালীপ্রসন্নর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সেই সময়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যে এমন এক নতুন ভাষ্য সৃষ্টি করে কালীপ্রসন্ন যেমন অমর হয়ে রয়েছেন, তেমনি সমাজচেতনা ও ঐতিহাসিক রস ছাড়া এখানে বর্ণিত হয়েছে হাস্যরস, যার স্থায়ী মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

একক ৬ ❑ গদ্যকার ও প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিবেকানন্দ

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রধান পরিচয় তিনি ঔপন্যাসিক। পাশাপাশি উনিশ শতকের একজন অগ্রণী চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন লঘুভঙ্গিতে এবং অবশ্যই প্রবন্ধের প্রথাগত গাম্ভীর্যে। শুধু সংখ্যাগত বিচারে নয়, বিষয়বৈচিত্র্যে এবং মননশীলতায় বঙ্কিম-প্রবন্ধ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' পদ্য ও গদ্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন। উপন্যাস এবং প্রবন্ধ দুক্ষেত্রেই শুরুটা করেছিলেন ইংরেজিতে। বেশ কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন ইংরেজিতে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা। মূলত এই পত্রিকা সম্পাদনা সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন এবং অচিরে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার প্রধান প্রাবন্ধিক।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা প্রবন্ধ গ্রন্থের তালিকায় রয়েছে— 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'বিজ্ঞান রহস্য' (১৮৭৫), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬), 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী' (১৮৭৭), 'কবিতা পুস্তক' (১৮৭৮), 'সাম্য' (১৮৭৯), 'প্রবন্ধ-পুস্তক' (১৮৭৯), 'দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি' (১৮৮৫), 'কৃষ্ণচরিত্র'—প্রথম ভাগ (১৮৮৭), 'ধর্মতত্ত্ব'—প্রথম ভাগ (১৮৮৮), 'বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯২), 'শ্রীমদ্ভাগবদগীতা' (১৯০২) প্রভৃতি। 'সহজ রচনা শিক্ষা' এবং 'সহজ ইংরাজী শিক্ষা' নামে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষার সাহিত্যিকদের নিয়ে লিখেছিলেন কয়েকটি প্রবন্ধ। যেমন— 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী', 'বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান', 'সঞ্জীবচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী' ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—তন্ময় প্রবন্ধ আর মন্ময় প্রবন্ধ। তন্ময় প্রবন্ধের মধ্যে পড়ে 'বিজ্ঞান রহস্য' (১৮৭৫), 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬), 'সাম্য' (১৮৭৯), 'প্রবন্ধ-পুস্তক' (১৮৭৯), 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব' ইত্যাদি। আর 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর' পড়ে মন্ময় প্রবন্ধের পর্যায়ে। বঙ্কিমের প্রায় সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত তিনটি পত্রিকাতে। পত্রিকাগুলি হল 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার' এবং 'ভ্রমর'। বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি রচিত হয় ১৮৭২ থেকে ১৮৯২ এর মধ্যে। বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্য-সমালোচনা, মনস্তত্ত্ব ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব জ্ঞানের প্রায় প্রতি শাখা অবলম্বনেই রচিত হয় বঙ্কিমের প্রবন্ধগুলি।

বঙ্কিমের প্রথম বিষয়মুখী প্রবন্ধ সংকলন 'বিজ্ঞান রহস্য'। 'বিজ্ঞান রহস্য'র মাধ্যমে তিনি দেখাতে

চেয়েছিলেন 'mystery of science' অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রাথমিক কথা। এটি তাঁর কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা গ্রন্থ নয়, ইংরেজি লেখকদের থেকে তথ্য উপাদান সংগ্রহ করে তিনি জটিল বিজ্ঞানের তত্ত্বকে বাঙালি পাঠক-পাঠিকা এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন। উনিশ শতকের বাংলায় নব্য হিন্দুত্বের যে জোয়ার এসেছিল তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু সেই জোয়ারে তিনি ভেসে যাননি। মুক্তবুদ্ধির আলোয় তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন হিন্দুধর্ম এবং তার অন্যতম প্রধান পুরুষ কৃষ্ণচরিত্রকে। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন প্রকৃত মানব ধর্মের স্বরূপ।

সমালোচক হিসেবেও বঙ্কিমের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমোনা', 'উত্তরচরিত' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অন্য বঙ্কিমকে খুঁজে পাওয়া যায়। 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধটি বঙ্কিমের মননশীলতার প্রতীক। শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা প্রত্যেকেই তাদের আপন গুণাবলীতে পরিপূর্ণ 'দেশভেদ বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্য হৃদয় সরল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্য হৃদয়ই থাকে। শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা নির্দিষ্ট গণ্ডি ও কালের ঊর্ধ্বে। তারা সর্বযুগের সর্বকালের। এই তিন নারীর অনুভব-অভিজ্ঞতা বিবরণের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম সমাজের এক বিশেষ অধ্যায়কে সমকাল এবং উত্তরকালের পাঠকের সামনে হাজির করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা ও তুলনামূলক বিচার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ছিল দেশ ও দেশবাসীর প্রতি গভীর প্রীতি। ফরাসি বিপ্লবের বাণী এবং নিজের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন দেশ ও দেশবাসীকে। লেখেন 'সাম্য'-এর মতো বৈপ্লবিক পুস্তিকা। সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে সাম্যবাদের প্রথম প্রচারক। সর্ব মানবের কল্যাণকারী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার যেরূপ বঙ্কিমের কাম্য ছিল, 'সাম্য' তারই ভাষারূপ। বাঙালি তিনি করতে চেয়েছিলেন ইতিহাসসচেতন ও দেশপ্রেমিক করতে। তিনি লিখেছিলেন, "বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না।" লিখেছিলেন 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' এর মতো নৃতত্ত্বভিত্তিক প্রবন্ধ। 'জ্ঞান', 'সাংখ্যদর্শন', 'মনুষ্যত্ব কি' ইত্যাদি প্রবন্ধে করেছেন দর্শনশাস্ত্রের সহজ উপস্থাপনা।

মন্ময় প্রবন্ধে রচয়িতার মনোভঙ্গি ও আবেগ প্রাধান্য পায়। অনেক সময় এধরনের প্রবন্ধে কাহিনির আভাস থাকে। 'লোকরহস্য' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর' এই জাতের রচনা। 'লোকরহস্য' সংকলনের প্রবন্ধগুলিতে মার্জিত ব্যঙ্গ আর হাল্কা হাসির আবরণে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজভাবনা ও দেশভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। বাঙালি চরিত্রের ত্রুটি দূর করার বাসনাই অপরূপ হয়ে উঠেছে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর রচনাগুলিতে।

এবার আলোচনায় আসা যেতে পারে বঙ্কিমী ভাষা প্রসঙ্গে। আদর্শ বাংলা গদ্য ভাষা কীরকম হওয়া উচিত তা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভেবেছিলেন। ভাষার প্রতি তিনি ছিলেন উদার, শব্দের বাহুল্য বাংলা ভাষার সরলতাকে কীভাবে হরণ করছে তা তিনি স্বীকার করেছিলেন। তিনি বাংলা গদ্য ভাষাকে যে স্তর থেকে পেয়েছিলেন তার উন্নতি সাধন করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান। পণ্ডিতি ভাষা ও ইংরেজি তর্জমা করা বাংলার

সমস্যাগুলোকে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের স্পষ্ট নিদান— "বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে।" বস্তুত বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের যে সমুন্নত আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র স্থাপন করেছিলেন, তা এই সাহিত্যশাখার ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রধান সোপান হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন একজন স্রষ্টা, যিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, নাট্যকার, গীতিকার ও প্রাবন্ধিক। প্রায় সবকটি ক্ষেত্রেই তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন। আমাদের আলোচ্য রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সংখ্যা কমবেশি আটশোটি। বিষয়ের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রবন্ধ যে কয়টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে তা হল সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সংগীত, ভাষা ও শব্দতত্ত্ব এবং বিবিধ। ১৮৭৬ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৭৬ থেকে ১৯১২ সময়কালে প্রকাশিত হয়েছে একের পর এক রবীন্দ্র প্রবন্ধগ্রন্থ। যেমন— 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'পঞ্চভূত', 'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ', 'চারিত্রপূজা', 'লোকসাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য' ইত্যাদি। ১৯১৭ থেকে ১৯৩০ সময়কালে পাই, 'শান্তিনিকেতন', 'সঞ্চয়', 'পরিচয়', 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'জাপান যাত্রী'-র মতো প্রবন্ধগ্রন্থ। ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ এর মধ্যে লেখা হচ্ছে 'রাশিয়ার চিঠি', 'মানুষের ধর্ম', 'কালান্তর', 'সভ্যতার সংকট', 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' এর মতো প্রবন্ধগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে 'আত্মপরিচয়', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'পল্লীপ্রকৃতি', 'বুদ্ধদেব', 'ভারত পথিক রামমোহন রায়', 'স্বদেশী সমাজ' প্রমুখ প্রবন্ধগুলোর। রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিপত্রের সংখ্যাও প্রচুর। সেগুলো ধরলে হয়তো এই তালিকা আরও দীর্ঘায়িত হবে।

মাত্র ১৫ বছর বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক জীবনের সূচনা। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা অবসর সরোজিনী ও দুঃখ সঙ্গিনী'। এটি 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার কার্তিক ১২৮৩ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সাহিত্য সমালোচনা মূলক গদ্য রচনা দিয়েই প্রবন্ধের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অবসর সরোজিনী' এবং হরিশচন্দ্র নিয়োগীর 'দুঃখ সঙ্গিনী' নিয়ে তিনি তাঁর প্রথম প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধ হলো 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনা 'মেঘনাদবধ কাব্য'। বলা যায় ১৮৭৬ থেকে ১৮৯০ কালপর্বেই রবীন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক সত্তার উন্মেষ ঘটে। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৮১তে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'। এই কালপর্বে রবীন্দ্রনাথের কলমে পদ্যের তুলনায় গদ্যের প্রাচুর্যই লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বে

প্রকাশিত অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১২৯০), 'আলোচনা' (১২৯২), 'সমালোচনা (১২৯৪) ইত্যাদি।

রবীন্দ্রপ্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ ১৮৯০ পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয় মাত্র তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থ। এগুলি হল 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি' (১ম খণ্ড, ১৮৯১), 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি' (২য় খণ্ড, ১৮৯৩) এবং 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭)। 'পঞ্চভূত'এর প্রবন্ধগুলি 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'পঞ্চভূতের ডায়েরি' নামে। পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত্ ও ব্যোমকে নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রবন্ধ গ্রন্থের বাহ্যিক অবয়ব। এর এক একটি ভূত আসলে এক একটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক। পঞ্চভূতের আড়ালে সজীব উপস্থিতি অনুমান করেন বিদগ্ধ সমালোচকেরা। এই অভিনব প্রবন্ধ গ্রন্থে একাধারে মিলেছে চিন্তার বৈচিত্র্য, জীবনের সমস্যা—সম্ভাবনার রূপায়ণ এবং অনন্য উপস্থাপনা ভঙ্গি। বিষয়ের অভিনবত্বে ও গদ্যরীতির অসাধারণত্বে এই বই শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যে নয়, বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ সৃষ্টি।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার তৃতীয় পর্ব। এই শতকের প্রথম দশকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থগুলি হল 'আত্মশক্তি' (১৯০৫), 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬), 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯০৭), 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭), 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭), 'সাহিত্য' (১৯০৭), 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭), 'রাজা প্রজা' (১৯০৮), 'স্বদেশ' (১৯০৮), 'সমাজ' (১৯০৮), 'শিক্ষা' (১৯০৮), 'শব্দতত্ত্ব' (১৯০৯), 'ধর্ম' (১৯০৯) ইত্যাদি। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ব্যক্তিগত প্রবন্ধের অসামান্য উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তু গৌরবে নয়, রচনার রস সম্ভোগে'। 'চারিত্রপূজা' জীবনীপ্রবন্ধের ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'প্রাচীন সাহিত্য' প্রাচীন ভারতের চিররহস্যের সৌন্দর্যপুরীতে প্রবেশের চাবিকাঠি যেন। একের পর এক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুললেন সাহিত্য সমালোচনার উচ্চ আদর্শ। 'রাজাপ্রজা'তে রয়েছে রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট শিক্ষাদর্শের প্রতিফলন পাই তাঁর 'শিক্ষা' গ্রন্থে। শব্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাই 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে। তাঁর অধ্যাত্মচিন্তা ও দার্শনিক ভাবনার আধার হল 'ধম' গ্রন্থ।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য দুটি গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রচনা দুটি হল 'জীবনস্মৃতি' এবং 'ছিন্নপত্র'। গদ্যরীতির দিক থেকে 'জীবনস্মৃতি' এক অতুলনীয় সৃষ্টি। এই অনন্য স্মৃতিচারণা বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ। 'ছিন্নপত্র'ও এক অনুপম সৃষ্টি। কবির জীবনদর্শন, ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় এই পত্রাবলীতে প্রকাশিত। এই শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' (১৯১৬), 'জাপানযাত্রী' (১৯১৯)। দশ বছরের রাশিয়ার চিঠি' ব্যবধানে প্রকাশিত হয় 'যাত্রী' (১৯২৯)। পরের বছর 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' (১৯৩০)।

জীবনের শেষ দশ বছরে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে আমরা পাই 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১), 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩), 'ছন্দ' (১৯৩৬), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬), 'কালান্তর' (১৯৩৭), 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭),

'বাংলা ভাষা পরিচয়' (১৯৩৮), 'পথের সঞ্চয়' (১৯৩৯), 'ছেলেবেলা' (১৯৪০), 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) এর মতো গ্রন্থগুলি। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত সর্বশেষ প্রবন্ধগ্রন্থ হল 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় 'আত্মপরিচয়', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'পল্লীপ্রকৃতি', 'স্বদেশীসমাজ' ইত্যাদি গ্রন্থ। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার নবজাগ্রত রূপ দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ যে দলিল রচনা করেছেন, তাই হল 'রাশিয়ার চিঠি'। 'কালান্তর' অসাধারণ রাজনৈতিক প্রবন্ধের সংকলন। গ্রন্থটিকে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানসচেতন চিন্তার অনবদ্য সাহিত্যিক প্রকাশ। 'ছেলেবেলা' অসামান্য স্মৃতিচিত্রণ। মানবসভ্যতার ক্রান্তিকালকে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছেন 'সভ্যতার সংকট' গ্রন্থে। ইতিবাচক বিশ্বাস ও প্রত্যয়ে শেষ করেছেন তাঁর বক্তব্য।

এটা ঘটনা, রবীন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক পরিচয় সাধারণের কাছে ততোটা স্পষ্ট নয়; অথচ তিনি বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। মননশীল প্রবন্ধ রচনায় সারা জীবন তিনি ছিলেন অক্লান্ত। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর। এত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অনায়াস বিচরণ আমাদের বিস্মিত করে। সাহিত্য, শিল্প, সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সংগীত, শব্দতত্ত্ব, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ের অসংখ্য প্রবন্ধ ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিমনের প্রতিফলনে দীপ্ত অসামান্য ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বিদগ্ধ সমালোচক অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাই লেখেন, "রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ।... ... এরকম প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে নয় পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ, এ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।"

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ইতিহাসে বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)

উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলে বিবেকানন্দ ওরফে নরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম হয়। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল বীরেশ্বর। বর্ধমানের কালনা মহকুমায় ছিল দত্ত পরিবারের আদি নিবাস। ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দুর্গ দখল করতে এলে তাঁরা সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ও মা ভুবনেশ্বরী দেবী ষষ্ঠসন্তান নরেন্দ্রনাথ ছোটো থেকেই সাহসী। স্বাধীন চিন্তন ও সত্যনিষ্ঠা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

বালক বিলের প্রথম পড়াশুনা শুরু হয়েছিল বাড়িতেই। এরপর ১৮৭১ সালে কলকাতার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন নরেন্দ্রনাথ। সেখানে বুদ্ধিমান ছাত্র হিসাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এই সময় থেকেই বালকের বিলের মধ্যে আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা জাগতে থাকে। পাশ্চাত্য দর্শনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো পড়তে শুরু করেন। তাঁকে প্রতিনিয়ত ভাবাতে থাকে স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ, হিউমের সংশয়বাদ, মিলের 'থ্রি এসেজ অন রিলিজিয়ন'। ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মার স্বরূপ কী? জানতে তিনি উৎগ্রীব হয়ে ওঠেন। স্কুলের পর্ব শেষ করে তিনি এক বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েন। কিন্তু কলা বিভাগে স্নাতক হন জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউট থেকে। কলেজে পড়ার সময়েই তিনি রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

পিতার মৃত্যুর বছর খানেকের মধ্যে রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগ নরেন্দ্রনাথকে বিচলিত করে তোলে। ১৮৮৭ সালে রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাস নেন। পরিব্রাজক হয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। এই সময়েই দেশবাসীর উন্নতির জন্য তিনি নানা শাস্ত্র ও ধর্মের বাণী তুলে ধরেন। এই পরিব্রাজক জীবনের শেষে ১৮৯৩ সালে তিনি আমেরিকার শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে ভারতের হয়ে যোগ দেন। সেখানে অভূতপূর্ব সাফল্যলাভের পর আমেরিকা ও ইউরোপে তিনি তাঁর সার্বভৌম আধ্যাত্মিকতার বাণী প্রচার করেন। তবে স্বামী বিবেকানন্দ নিছক সন্ন্যাসীই ছিলেন না; পাশাপাশি তিনি ছিলেন সমাজসংস্কারক, দেশপ্রেমিক এবং সাহিত্যিক।

আসা যাক সাহিত্যিক বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে। তিনি নিজেই বলেছিলেন সাহিত্যিক হতে গেলে পাঠক হতে হয়। পাশাপাশি নিজের জীবনকে জানারও আগ্রহ থাকতে হয়। নিজেকে জানার মধ্য দিয়েই বিবেকানন্দের নিজের লেখকসত্তা গড়ে উঠেছিল। বিবেকানন্দের নিজস্ব ভাবনা ও ধ্যানধারণার প্রকাশ পাওয়া যায় 'উদ্বোধন' পত্রিকায়। এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যকর্ম ও সাহিত্য চিন্তারও পরিচয় মেলে। 'উদ্বোধন' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৯ সালের ১৪ই জানুয়ারি। বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন নিজের ধ্যান ধারণা ও মতাদর্শকে ছড়িয়ে দেওয়ার একমাত্র মাধ্যম হল পত্রিকার পৃষ্ঠা। এই ভেবেই মূলত পত্রিকা প্রকাশের ভাবনা করেছিলেন তিনি। উদ্বোধন ছাড়া মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত দুটি ইংরেজি পত্রিকাকেও প্রেরণা যুগিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। অনেকেই ভাবেন এই পত্রিকাগুলির মধ্য দিয়ে তিনি শুধুমাত্র ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রচার করতে চেয়েছিলেন, কিংবা নিজের উদ্দেশ্যর কথা ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন, এমনটা নয়। তিনি এর মধ্য দিয়ে ধনী, দরিদ্র, পরাধীন, সংস্কারাচ্ছন্ন দেশের মানুষের সমস্যা দূর করার কথা বলেছিলেন। আসলে স্বামী বিবেকানন্দ যে সময়ে বেড়ে উঠেছিলেন তখন দেশের একদিকে যেমন ছিল দরিদ্র পীড়িত মানুষ তেমনই অন্যদিকে ছিল পরাধীনতা, আর্থ সামাজিক অস্থিরতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, শঠতা। পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত ছিল ভারতীয় সমাজ। এই সময়েই স্বামীজি তাঁর যুক্তি, দর্শন ও বিজ্ঞানকে প্রেমের আবরণে মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতে থাকলেন। বেদান্ত দর্শনের উপর ভিত্তি করেই রচিত হল তাঁর দর্শন। যেখানে বলা হল ব্রহ্ম সত্য জগত মায়া। জগতের মতো জীবও ব্রহ্মের অংশ, তাই ব্রহ্মের মধ্যে লীন হওয়াতেই জীবের মুক্তি। এভাবেই তাঁর অপার প্রেমের আলোয় ভারতবাসী উদ্বুদ্ধ হতে থাকেন।

এই ভাবনা থেকেই তাঁর গ্রন্থগুলি রচিত হতে থাকে। বিবেকানন্দের সর্বমোট চারটি গ্রন্থ বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। ভারতীয় ঐতিহ্য, ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যা নিয়ে বহু তথ্যসমৃদ্ধ রচনা এই গদ্যগ্রন্থগুলি। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তাঁর 'ভাববার কথা' (১৯০৫) গ্রন্থের কথা। পরাধীন ভারতের বিভিন্ন দিক নিয়ে সর্বমোট নয়টি প্রবন্ধ অবলম্বনে 'ভাববার কথা' গ্রন্থিত হয়। সেগুলি হল 'হিন্দু ধর্ম ও শ্রী রামকৃষ্ণ', 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি', 'ঈশা অনুসরণ', 'বর্তমান সমস্যা', 'বাঙ্গালা ভাষা', 'জ্ঞানার্জন', 'ভাববার কথা', 'পারিপ্রদর্শনী', ও 'শিবের ভূত'। এই গ্রন্থে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'হিন্দু ধর্ম ও শ্রী রামকৃষ্ণ'। এটি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৭ সালে। গ্রন্থটির মধ্যে দিয়ে তিনি জীর্ণ ও প্রাচীন প্রথা ভেঙে সকলকে নবধর্ণে

প্রাণিত হওয়ার আহ্বান জানান। নিজে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে যে তিনি হিন্দুধর্মের সমস্ত কিছুকে সমর্থন করেছিলেন, এমনটা নয়। এর মধ্য দিয়ে তাঁর স্পষ্টবাদিতা ও স্বাধীন চিন্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'ভাববার কথা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লস এঞ্জেলস থেকে রামকৃষ্ণ মঠ পরিচালিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদককে যে চিঠি লিখেছিলেন সেই পত্র থেকে উদ্বৃত 'বাঙ্গালা ভাষা' শিরোনামের প্রবন্ধটি ভাববার কথা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি বাংলা ভাষার রীতি প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি এই প্রবন্ধে বলেছিলেন, "স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ-ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে।" এর মাধ্যমে খুব সহজেই বোঝা যায় যে বিবেকানন্দ চলিত ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির উপর জোর দিয়েছেন। আসলে তিনি নিজেও চলিত ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করে আনন্দ লাভ করেছিলেন। বিবেকানন্দের চারটি গ্রন্থের মধ্যে 'বর্তমান ভারত' (১৯০৫) শুধুমাত্র সাধু ভাষায় লেখা। বাকি 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক' (১৯০৩) ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থ তিনটি চলিত বাংলায় লেখা। আসলে স্বামী বিবেকানন্দ এক বিশেষ বাংলা গদ্য রীতির প্রবর্তন করেছিলেন। প্রতিদিনের মুখের ভাষাকে আশ্রয় করে তিনি এই গদ্য রীতিকে রূপ দিয়েছিলেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থটিতে এর প্রকাশ পাওয়া যায়। শব্দ নির্বাচনে ছ্যুৎ মার্গ পরিত্যাগের ফলে বিবেকানন্দের ভাষা হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত ও অধিক মনোগ্রাহী। এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (১৩০৬ থেকে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে)। এরপর তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯০৩তে। দুই সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনাই ছিল এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। জাতি ধর্ম, পোশাক ফ্যাশান, মানুষের শারীরিক বিশিষ্টতা ইত্যাদি এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে উল্লেখ আছে। তবে গ্রন্থটি হঠাৎই শেষ হয়ে গেছে বলে মনে করা হয়। আরও বিস্তৃত আলোচনা থাকলে ইউরোপীয় ভাস্কর্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতামত জানতে পারা যেত। এরপর উল্লেখ করা যায় 'পরিব্রাজক' গ্রন্থটির কথা। এটিও চলিত ভাষায় লেখা। এটি লেখা হয়েছিল ১৮৯৯ সালে বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশ পরিভ্রমণের বিবরণ অবলম্বন করে। এছাড়া তংার লেখা 'বর্তমান ভারতের' প্রবন্ধগুলি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ধারাবাহিকভাবে ১৩০৫ থেকে ১৩০৭ এই সময়ের মধ্যে। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে স্বামী সারদানন্দের সম্পাদনায়। সাধু ভাষায় লেখা এই বইটিতে ভারতের ইতিহাস, ধর্মীয় দর্শনের পরিচয় পাওয়া গেছে। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু অন্য গ্রন্থগুলির তুলনায় গম্ভীর। এই কারণেই হয়তো এখানে সাধু ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি পাঠকের কাছে খুব বেশি জনপ্রিয় না হলেও এর উপসংহারে উদ্ধৃত বিবেকানন্দের বাণী সকলের মনে প্রাণে গ্রথিত— 'হে ভারত ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র অজ্ঞ, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।'

এভাবেই প্রবন্ধ ও বেশ কিছু চিঠিপত্র রচনার মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন। উনিশ শতকের শেষলগ্নে এক বিশেষ গদ্য রীতির প্রবর্তন করে যান তিনি। দেখিয়ে দেন মুখের ভাষাকে অবলম্বন করে কীভাবে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। খাঁটি চলিত ভাষাকে অবলম্বন করে তিনি

যেভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন তা তাঁর পূর্বে বা পরে আর কারুর মধ্যে দেখা যায়নি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও তাঁর প্রকাশের কৌশলে হয়ে উঠেছে সহজ ও প্রাণবন্ত। বাংলা গদ্যের সার্বিক বিবর্তনে মৌলিক অবদানের জন্য বিবেকানন্দ বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে এক অপরিহার্য অধ্যায়।

অনুশীলনী

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী:

১। বাংলা গদ্যের উদ্ভবে মুদ্রণযন্ত্রের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২। বাংলা সংবাদপত্রের আবির্ভাব কীভাবে বাংলা গদ্যকে বিকশিত করে, তা আলোচনা করুন।

৩। বাংলা গদ্যের উদ্ভবে শ্রীরামপুর মিশনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

৪। বাংলা গদ্যের উদ্ভবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান আলোচনা করুন।

৫। রাজা রামমোহন রায়কে বাংলা গদ্যের জনক বলা যায় কি না আলোচনা করুন।

৬। বাংলা গদ্যের বিবর্তনে অক্ষয়কুমার দত্তের ভূমিকা উল্লেখ করুন।

৭। বাংলা গদ্যের বিকাশে বিদ্যাসাগরের অবদান আলোচনা করুন।

৮। বাংলা চলিত গদ্যের বিবর্তনে প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের ভূমিকা বিচার করুন।

৯। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের কৃতিত্ব ব্যাখ্যা করুন।

১০। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান আলোচনা করুন।

১১। প্রাবন্ধিক বিবেকানন্দের কৃতিত্ব পর্যালোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। 'A grammar of the Bengali Language' কার লেখা?

[এটি ১৭৭৮এ লেখেন ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড।]

২। 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রং' কার লেখা? প্রকাশকাল উল্লেখ কর।

[এটি রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়ের লেখা। সাল ১৮১১।]

৩। 'প্রভাবতী সম্ভাষণে'র বিষয়বস্তু কি?

[বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন বছরের মেয়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এটি লেখা হয়েছিল। এটি বাংলা গদ্যে লিখিত প্রথম শোকগাথা।]

৪। কে কাকে বাংলা গদ্যের যথার্থ শিল্পী বলেছেন?

[রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছিলেন।]

৫। বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থ কোনটি?

[রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'।]

৬। রামমোহনের লেখা ব্যাকরণটির নাম কি? এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

['গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। এর প্রকাশকাল ১৮৩৩।]

৭। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে কোন কোন পাশ্চাত্যের লেখকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন?

[বেন্থামের উপযোগবাদ এবং কোঁৎ-এর ধ্রুববাদের আদর্শের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।]

৮। বিবেকানন্দের লেখা বিখ্যাত বাংলা প্রবন্ধ কোনটি? এটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল?

['বর্তমান ভারত' হল বিবেকানন্দের লেখা বিখ্যাত বাংলা প্রবন্ধ। এটি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।]

৯। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের নাম লেখো।

['প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (১৯০৯), 'দেববাণী' (১৯০৯)]

১০। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী মূলক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ গ্রন্থ কোনটি? এটি কোন ভাষায় লেখা?

[রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ গ্রন্থ 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২)। এটি সাধু ভাষায় লেখা।]

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (ষষ্ঠ খণ্ড), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ ২০১১

২। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (পঞ্চম খণ্ড), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৫ পুনমুর্দ্রণ ২০০৬

৩। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (দ্বিতীয় পর্যায়), ভূদেব চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ১৯৯৯

৪। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (চতুর্থ খণ্ড), সুকুমার সেন আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৩ অষ্টম মুদ্রণ ২০১৪

৫। 'পশ্চিমবঙ্গ', বিদ্যাসাগর সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০১

৬। 'পশ্চিমবঙ্গ', রবীন্দ্র সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৩

মডিউল-২

কাব্য-কবিতা

মডিউল ২ : কাব্য কবিতার ধারা

গঠন

উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

একক ৭.১ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

একক ৭.২ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

একক ৮.১ মধুসূদন দত্ত

একক ৮.২ নবীনচন্দ্র সেন

একক ৯ বিহারীলাল চক্রবর্তী

একক ১০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একক ১১.১ মোহিতলাল মজুমদার

একক ১১.২ : নজরুল ইসলাম

একক ১১.৩ কায়কোবাদ

একক ১১.৪ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

একক ১২.১ জীবনানন্দ দাশ

একক ১২.২ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

একক ১২.৩ অমিয় চক্রবর্তী

একক ১২.৪ বুদ্ধদেব বসু

একক ১২.৫ বিষ্ণু দে

একক ১২.৬ সমর সেন

একক ১২.৭ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

একক ১২.৮ কবিতা সিংহ

অনুশীলনী

উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

বাংলা কাব্যসাহিত্যের ধারায় মোট আঠারোজন কবিকে বেছে নেওয়া হয়েছে ৭-১২ এককের মধ্যে। যাঁদের মধ্যে প্রথমজন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) এবং শেষজন কবিতা সিংহ (১৯৩১-১৯৯৮)। তাঁর পূর্ববর্তী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনকাল (১৯১৯-২০০৩)। অর্থাৎ এই আঠারোজন কবি উনিশ শতকের শুরু থেকে বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত দুই শতাব্দীর বাংলা কাব্যধারার প্রতিনিধিত্ব করছেন। মধ্যযুগের অবসানের পর আধুনিক বাংলা কবিতা ঠিক কোন ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল তা দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। এই দুই শতকে বাংলা সাহিত্যে শুধু কাব্যক্ষেত্রের দিকে তাকালেই দেখা যাবে অনেক কবি এসেছেন। সেই ধারাবাহিক ইতিহাসকেই পড়ুয়াদের জানাতে দুশ বছরের বাংলা কবিতার প্রতিনিধিস্থানীয় আঠারোজন কবিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বাংলা ভাষার সেই অসংখ্য কবিদের মধ্যে মাত্র আঠারোজনকে বেছে নেওয়া সহজ কাজ নয়। পাঠ্যসূচির সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখেও তবু সময়ের প্রতিনিধিত্বকে ধরে এই তেরোজন কবিকে নির্বাচন করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আধুনিক যুগের এমন একজন কবি যুগসন্ধির বৈশিষ্ট্য যাঁর কবিতার ভাবে ও দেহে পাওয়া যায়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার আখ্যানকাব্যের ধারায় উল্লেখযোগ্য কবি। এরপর মধুসূদন দত্ত। যাকে বাদ দিয়ে বাংলাকাব্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাংলা মহাকাব্যের ধারায় তিনি একক। বাংলা গীতিকাব্যের ধারায় তিনি অনন্য। আবার অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং চতুর্দশপদী কবিতার ক্ষেত্রেও তিনি পথ-প্রদর্শক। সেই মহাকাব্যের এবং গীতিকাব্যের ধারায় এসে যান উনিশ শতকের দুই বিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন— যাঁদের মধ্যে পাঠ্যসূচিতে নবীনচন্দ্রকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বাংলা গীতিকাব্যের ধারায় যিনি পথিকৃৎ, রবীন্দ্রনাথের 'ভোরের পাখি' বিহারীলাল চক্রবর্তীকে এই এককের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলা মহাকাব্যের ধারায় ব্যর্থ হলেও কায়কোবাদ সম্পর্কে জানা দরকার। না হলে সাহিত্যের ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে না। কায়কোবাদ এমন একজন কবি যিনি নজরুল ইসলামের অনেক আগে জন্মগ্রহণ করেছেন। বাঙালি কবি হিসেবে একদিকে তিনি যেমন ছিলেন মিলনের কবি অপরদিকে মুসলমান সমাজের অগ্রগতির জন্যে তাদেরকে ঐতিহ্য-সচেতন করার কবি।

বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ছাত্রদের সম্যকরূপে জানা প্রয়োজন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো ওই ব্যক্তিত্বের পর বাংলা সাহিত্যের লেখকরা রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হয়ে কীভাবে স্বতন্ত্র পথ খুঁজেছিলেন তাও ইতিহাসের দাবিতেই জানা জরুরি। রবীন্দ্রোত্তর যুগে যারা প্রথম রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের বিপ্রতীপে হেঁটে নতুন পথ খুঁজেছিলেন তাঁরা হলেন মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) এবং নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। এঁদের মধ্যে দুজনকে বেছে নেওয়া হয়েছে এই মডিউলে। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুল। নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যের পাঠকদের কাছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই উচ্চারিত একটি নাম। কিন্তু বাংলা কাব্যে আধুনিকতা প্রয়াসে তাঁকে স্মরণ করা হলেও আধুনিক কবি হিসেবে বলা হয় মূলত পাঁচজন কবির কথা— জীবনানন্দ দাশ

(১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) এবং বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম জীবনানন্দকেই বেছে নেওয়া হয়েছে আধুনিক কবিদের প্রতিনিধিরূপে। জীবনানন্দ পরবর্তী কবিদের মধ্যে আছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যিনি দীর্ঘসময় ধরে বাংলা কাব্যজগতে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কবিতা সিংহ আধুনিক মহিলা কবিদেরও প্রতিনিধিত্ব করেন যদিও লেখকের পুরুষ ও মহিলা বিভাজন অনুচিত। তবু উনিশ শতকের মহিলা কবিদের উত্তরসূরী শুধুই একজন মহিলা লেখক না কি মহিলা পরিচয় উড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতা-পরবর্তী একজন উজ্জ্বল বাংলা কবি হিসেবেই তাঁকে দেখা উচিত— সাহিত্যের ছাত্রদের এই বিতর্কের পাঠ নেওয়া প্রয়োজন।

৭.১ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

২.১ জীবন : ১৭৩৩ শক অর্থাৎ ১২১৮ বঙ্গাব্দের ২৫ ফাল্গুন কাঁচরাপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। পিতা হরিনারায়ণ গুপ্ত, মাতা শ্রীমতী দেবী। শৈশবে তাঁর মাতৃবিয়োগ হলে পিতা দ্বিতীয় বিবাহ করেন। বিমাতাকে মন থেকে মেনে নিতে পারেননি ঈশ্বরচন্দ্র। এরপর অবশ্য মাতুলালয় চলে যান। স্বভাবকবি ঈশ্বরগুপ্ত না কি মাত্র তিন বৎসর বয়সেই বলে উঠেছিলেন—

রেতে মশা দিনে মাছি
এই তাড়য়ে কলকাতায় আছি।

দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে প্রথাগত পড়াশোনায় সেভাবে শেখেননি।

১৫ বছর বয়সে গুপ্তিপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁদের দাম্পত্যজীবন সুখের হয়নি। এর প্রভাব ঈশ্বরচন্দ্রের প্রেমকবিতায় পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, তিনি তাঁর কবিতার নায়িকাদের 'বান্দরী'তে পরিণত করেছেন। ২০ মাঘ, ১২৬৫ বঙ্গাব্দে (২৩ জানুয়ারি, ১৮০৯) গুপ্তকবির জীবনাবসান হয়। *ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব* নামে বঙ্কিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থাবলির ভূমিকায় একটি মূল্যবান আলোচনা করেন।

২.২ সংবাদপত্র সম্পাদনা : ১২৩৭ বঙ্গাব্দের ১৬ মাঘ *সংবাদ প্রভাকর* বলে (১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি) প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। প্রায় দেড় বছর বন্ধ থাকার পর ১৮৩৬ এর ১০ আগস্ট পুনরায় পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথম বাংলা দৈনিক হিসেবে *সংবাদ প্রভাকর* ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন থেকে প্রকাশিত হয়। যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর অন্যতম সহায় ছিলেন। এছাড়াও অন্য ধনাঢ্য ও বিশিষ্ট লেখকদের তালিকা তিনি ১২৫৩ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। লিপি বিষয়ে তাঁর অন্যতম সহায় ছিলেন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ। এই সংবাদ প্রভাকরের পাতাতেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ অধিকারীর বিখ্যাত 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ' হয়েছিল। *সংবাদ প্রভাকর* বাদেও তিনি *সংবাদ রত্নাবলী* (১৮৩২),

পাষণ্ড পীড়ন (১৮৪৬), *সংবাদ সাধুরঞ্জন* (১৮৪৭) ইত্যাদি পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

২.৩ সাহিত্যকর্ম : তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত হয়, *কবিবর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত* (১৮৫৫) এবং *প্রবোধ প্রভাকর* (১৮৫৮) নামে গদ্যে-গদ্যে লেখা নীতি ও ধর্মশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ। এছাড়াও কবিবর রামপ্রসাদ সেনের কালীকীর্তন ১৮৩৩ সালে তাঁর উদ্যোগেই প্রকাশিত হয়। প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনীসংগ্রহে তিনি প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় *হিতপ্রভাকর* (১৮৬১), সংস্কৃত নাটক *প্রবোধ চন্দ্রোদয়*-এর গদ্যপদ্যাশ্রিত অনুবাদ। ১৯১৩ সালে তাঁর রচিত *সত্যনারায়ণের পাঁচালী* প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি অনেক কবিগানও রচনা করেছিলেন। তবে তিনি বাংলাসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর কবিতার জন্যেই।

তাঁর কবিতাগুলিকে নীতি ও ধর্ম বিষয়ক, প্রেম বিষয়ক, প্রকৃতি বিষয়, স্বদেশ প্রেম বিষয়ক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। বিচিত্র বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন কবি। 'পাঁটা', 'এণ্ডাওয়ালা তপ্স্যা মাছ', 'আনারস' তাঁর কবিতার বিষয় হয়েছে। বিষয় হয়েছে পৌষ পার্বণ, বড়দিন এর মতো উৎসবও। খাঁটি বাঙালি কবি বাংলার সমাজের সঙ্গে তাদের খাদ্য, আচার, জীবনচর্যার খুঁটিনাটিকে বিষয় করেছেন।

তবে সমসাময়িক বিষয়, ব্যক্তিত্ব বা ঘটনাবলি নিয়ে লেখা কবিতাগুলোতেই গুপ্তকবির প্রতিভার প্রকাশ সর্বাধিক। স্বদেশ প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রে বলতে হয় তাঁর আগে বাংলায় এভাবে কেউ স্বদেশ-বন্দনা করেননি। 'মিছা মণি মুক্তা হেম/স্বদেশের প্রিয় প্রেম/তার চেয়ে রত্ন নাহি আর' বা 'কতরূপে স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'— এই পঙ্‌ক্তি স্মরণযোগ্য।

প্রেমের কবিতায় তাঁর ব্যর্থতার কারণ আমরা আগেই আলোচনা করেছি। প্রকৃতি বিষয়ক কিছু গম্ভীরভাবের কবিতা তাঁর আছে। নীতি বা ধর্ম বিষয়ক কবিতাগুলিতে তাঁর ঈশ্বরভক্তির প্রকাশ ঘটেছে—

গুপ্ত হয়ে যখন মুদিব আমি আঁখি
তখন এ গুপ্তসুতে কিসে দিবে ফাঁকি

সমসাময়িক ঘটনাবলি নিয়ে লেখা কবিতাতে বিষয় হয়েছে সমকালীন যুদ্ধ, সেখানে ইংরেজদের জয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন কবি—

ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়
মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়

আবার নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ দিতে পিছপা হননি তিনি—

না বুনলে নীল মেরে কিল,
'কিল' করে নীলকরে

সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি, বিধবা বিবাহ বা স্ত্রীশিক্ষার মত প্রগতিশীল ভাবনাকে মেনে নিচ্ছেন না আবার কৌলিন্য প্রথার বিরোধিতা করেছেন, নীলকরদের অত্যাচারকে তুলে ধরছেন— এই দ্বৈধতা ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় যেমন পাই, তেমনি সাংবাদিক সত্তা আর কবিসত্তার মধ্যেও বিরোধ পাই।

বাস্তব বিষয়কে নিয়ে লেখা কবিতা আর রঙ্গব্যঙ্গের প্রয়োগ তাঁর কবিতাকে সমসময়ে জনপ্রিয় করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ বলেছিলেন— তিনি 'Realist এবং Satirist'। 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা', 'শয্যায় ভার্যায় প্রায় ছারপোকা ওঠে গায়', 'বাপ পূজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে', 'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর/যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর'— এই সব অজস্র পঙ্‌ক্তি তাঁকে বিখ্যাত করেছিল।

খ্রিস্টান ধর্ম ও সভ্যতার অন্ধ অনুকারকদের প্রতি ব্যঙ্গ—

ধন্য রে বোতলবাসী ধন্য লাল জল
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতা সকল।

ইয়ং বেঙ্গলদের প্রতি ব্যঙ্গ—

সোনার বাঙাল করে কাঙাল ইয়ং বাঙাল যত জনা

ইংরেজি শিক্ষিত মেয়েদের আচার এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রচারক বেথুনকে ব্যঙ্গ—

আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল ব্রতধর্ম কর্তো সবে
একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে
তখন এ বি শিখে বিবি সেজে বিলিতি বোল কবেই কবে

বিধবাবিবাহ নিয়ে বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ—

অগাধ সাগর বিদ্যাসাগর তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা
তাতে বিধবাদের কুলতরী অকূলেতে কূলপেল না

অক্ষয়কুমার দত্তকে ব্যঙ্গ—

কোথা তার "বাহ্যবস্তু" মানবপ্রকৃতি।
এখন ঘটেছে তায় বিষম বিকৃতি।

সিপাহী বিদ্রোহের নানাসাহেবকে ব্যঙ্গ—

সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে দস্যি ভেড়ে নস্যি কর তারে

কবিতাতে অনুপ্রাস ও যমকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার অনেক সময় কবিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

রঙ্গ-ব্যঙ্গের প্রবল প্রতাপে কবিতার গাম্ভীর্য সবসময় রক্ষিত হয়নি। কবি ঈশ্বর গুপ্তর কবিতা সম্পর্কে এই অভিযোগগুলি আসবেই। সমকালীন ঘটনা নিয়ে লেখা অসংখ্য কবিতা একদিকে যেমন তাঁকে বিখ্যাত করেছিল, তেমনি গুপ্ত কবি কবিওয়ালা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে কবি হয়ে উঠেছিলেন কি না সে নিয়ে বিতর্কের শেষ আজও হয়নি। তিনি কি যুগসন্ধির কবি না কি অনাগত যুগকে অতিক্রম করে নতুন যুগের নকিব— এই বিতর্কেও শেষ হবে না। তবু বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিকতার ছোঁয়া তার হাত ধরেই এসেছিল ইতিহাসের খাতিরেও বোধহয় এই কথা অস্বীকার করা যাবে না।

৭.২ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৩.১ জীবন : ১২৩৩ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ (২১ ডিসেম্বর, ১৮২৬) বর্ধমানের কালনার কাছে বাকুলিয়া গ্রামে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামনারায়ণ, মাতা হরসুন্দরী। তিনি হুগলি কলেজের ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত, ইংরেজি ও ওড়িয়া ভাষাতে কৃতবিদ্য মানুষটি কর্মসূত্রে কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। পরে আয়কর নিয়ামক, ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করেন। ১৮৭৬ সালে কনিষ্ঠ পুত্রর ও ১৮৭৮ সালে পত্নীর মৃত্যু তাঁকে মানসিকভাবে দুর্বল করে ফেলে। শেষজীবনে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এইসময় কন্যার মৃত্যুতে তাঁর শেষ অবলম্বনটুকুও চলে যায়। ১৮৮৭ সালের ১৩ মে তাঁর জীবনাবসান হয়।

৩.২ সাহিত্যকীর্তি : ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যস্থানীয় রঙ্গলাল সংবাদ প্রভাকরের নিয়মিত লেখক ছিলেন। পরে তিনি *সংবাদ রসসাগর* (পরিবর্তিত নাম সংবাদ রসসার) ও *এডুকেশন গেজেট* পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৮৫২ সালে বেথুন সোসাইটিতে বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৮৬০ সালে *শরীর সাধনী বিদ্যাশিক্ষার গুণেঅৎকীর্তন* নামে একটি ছাত্রপাঠ্য পুস্তিকা লেখেন।

আমরা এই উপ-এককে রঙ্গলালের কাব্যসাহিত্য নিয়েই আলোচনা করব।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় *পদ্মিনী উপাখ্যান*-এর কথা। তাঁর আগে যদিও তিনি হোমারের নামে প্রচারিত একটি ব্যঙ্গকাব্যের *ভেক মুষিকের যুদ্ধ* নামে অনুবাদ করেন (প্রকাশসাল ১৮৫৮)। ভেক ও মুষিকদের যুদ্ধ নিয়ে তিন সর্গে এই রঙ্গ-কাব্য লেখেন। এছাড়াও কালিদাসের *ঋতুসংহার* কাব্যের পদ্যানুবাদ (১৮৫১) করেছিলেন বলে *সংবাদ প্রভাকরের* বিজ্ঞাপন থেকে অনুমান করা হয়।

পদ্মিনী উপাখ্যান বাংলা কাব্যধারায় আখ্যানকাব্যের সংযোজন। কর্ণেল টডের লেখা রাজস্থান-কাহিনি *(Anal and Antiquities of Rajasthan)* থেকে বিষয়-সংগ্রহ করেন কবি। পদ্মিনী উপাখ্যানের কাহিনিসংক্ষেপ হল— দিল্লীর অধিপতে আলাউদ্দিন চিতোরের রাণা ভীমসিংহের পত্নী রাণী পদ্মিনীর অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা শুনে তাকে অধিকার করার জন্যে চিতোর আক্রমণ করেন। কিন্তু দুর্গ অধিকার করতে ব্যর্থ হয়ে রাণার কাছে প্রস্তাব করেন যে, একবার পদ্মিনীকে দেখেই ফিরে

যাবেন। দর্পণে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখে আলাউদ্দিন উন্মাদ হয়ে তাকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলেন। পদ্মিনী নিজের বুদ্ধিবলে স্বামীকে উদ্ধার করলেন। সেনাপতি গোরা ও রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র বাদলের বীরত্বে আলাউদ্দিনকে প্রচুর সৈন্যক্ষয় করে পিছু হটতে হল। যদিও গোরা, বাদল সহ বহু রাজপুত-সেনাও যুদ্ধে প্রাণ দিল। বর্ষশেষ না হতে হতেই আলাউদ্দিন পুনরায় বহু সৈন্য নিয়ে ফিরে এলেন। অসম যুদ্ধ জেনেও বীর ভীমসিংহ সমরযাত্রা করলেন। তাদের বিদায় দিয়ে পদ্মিনী, অন্যান্য রাজপুত নারীদের নিয়ে চিতা সাজিয়ে অগ্নিতে প্রাণ-বিসর্জন দিলেন।

'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র পঙ্‌ক্তি—

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?

পরাধীন ভারতে দেশাত্মবোধ প্রসারের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। আখ্যান কাব্য, ঐতিহাসিক বিষয় নির্ভর কাব্য— এই দুই দিক থেকেই *পদ্মিনী উপাখ্যান* বাংলাসাহিত্যে অভিনবত্বের দাবিদার। নতুন বিষয়, কিন্তু ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে পুরাতন রীতিকেই বেছে নিয়েছিলেন।

এর পরের কাব্য *কর্মদেবী* (১৮৬২)। যশল্মীরের পুগল প্রদেশের ভট্টিজাতির অধিপতি অনঙ্গদেবের বীরপুত্র সাধু কাব্যের নায়ক। বিপাশা-তীরে জালন্ধরের কাছে বিরাট মুসলমান বণিকবাহিনীকে পরাস্ত করে সাধু। এরপর ঔরিন্ট নগরে নগরে গোহিল-রাজপুতদের নেতা মাণিকদেবের অতিথি হন। মাণিকদেবের কন্যা ষোড়শী কর্মদেবী ও সাধুর পারস্পরিক অনুরাগ জন্মে এবং সাধু রঙ্গভূমিতে বীরত্বের পরিচয় দিয়ে কর্মদেবীকে লাভ করে। পিতার সম্মতিতে তাদের বিবাহ হয়। এর আগে রাঠোররাজ অরণ্যকমলের সঙ্গে কর্মদেবীর বিবাহ স্থির হয়েছিল। তাই প্রত্যাখ্যাত, অপমানিত অরণ্যকমল সাধুকে যুদ্ধে আহ্বান করে। যুদ্ধ সাধু নিহত হলে কর্মদেবী দুই হাত অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন করে যথাক্রমে ভ্রাতা ও পিতাকে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে স্বামীর চিতায় প্রাণবিসর্জন দেন। পিতা মাণিকদেব তাদের দাহস্থানে কর্মসরোবর খনন করে তার তীরে কর্মদেবীর প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করলেন। এখানেও পুরাতন রীতিতেই আখ্যানকাব্য রচনা করেছেন রঙ্গলাল। বিদেশি বণিকদের কাছে দেশের সোনা বিকিয়ে গেছে— কর্মদেবীর এই কাহিনির সঙ্গে দেশপ্রেমিক কবির সমকালকেই খুঁজে পাবেন পাঠক।

১৮৬৮-তে প্রকাশিত *শূরসুন্দরী* আখ্যানকাব্যও টডের রাজস্থান কাহিনি থেকেই গৃহীত। কাহিনিটি হল এই— বিকানেরের রাজভ্রাতা পৃথ্বীসিংহ, সম্পর্কে যিনি রাণা প্রতাপের ভাই শক্তসিংহের জামাতা, তিনি আকবরের অন্যতম সভাকবি ছিলেন। তাঁর পত্নীর রূপের খ্যাতি শুনে মুগ্ধ আকবর নওরোজের উৎসবে তাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেন। যদিও তিনি সেই তেজস্বী নারীর কাছে অপদস্থ হয়ে অঙ্গীকার করতে বাধ্য হন, আর কখনো ছলে-বলে-কৌশলে রাজপুত নারীকে নিজপুরে আনবেন না। কাব্যটিতে চারটি গান ও একটি দেবীস্তোত্র আছে।

১৮৭৯-তে প্রকাশিত হয় তাঁর *কাঞ্চীকাবেরী* নামে আখ্যানকাব্য। উৎস পুরুষোত্তম দাসের সমনামের প্রাচীন ওড়িয়া কাব্য। পুরীর রাজা পুরুষোত্তম কাঞ্চী রাজকন্যা পদ্মাবতীর পিতার কাছে বিবাহপ্রস্তাব পাঠান। জগন্নাথদেবের রথযাত্রার আগে রাজা সোনার সমার্জ্জনী দিয়ে পথ-পরিষ্কার করেন। কাঞ্চীরাজ এজন্যে তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে রাজি হন নি। পরে কীভাবে পদ্মাবতীর সঙ্গে রাজা পুরুষোত্তমের বিবাহ হল—সেই মধুর সমাপনের কাহিনি বলেছেন রঙ্গলাল।

এছাড়াও রঙ্গলাল কালিদাসের কুমারসম্ভবের অনুবাদ করেন (১৮৭২)। সংস্কৃত উদ্ভট ও নীতি কবিতার অনুবাদ করে *নীতি কুসুমাঞ্জলি* নামে গ্রন্থ লেখেন (১৮৭৫)। তিনি পার্নেল ও গোল্ডস্মিথের *হার্মিট* কাব্যেরও অনুবাদ করেন। সংবাদ প্রভাকরে ১২৬৫ বঙ্গাব্দে তা প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা কাব্যে যে আধুনিকতার সূচনা করেছিলেন, তার প্রসার ঘটেছিল রঙ্গলালের হাতে। গুপ্তকবি আর মধুকবির মধ্যে সংযোজক হিসেবে বাংলাকাব্যক্ষেত্রে বিরাজ করছেন রঙ্গলাল।

একক ৮.১ ❑ মধুসূদন দত্ত

৮.১.১ জীবন : ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে মধুসূদনের জন্ম হয়। পিতা রাজনারায়ণ মাতা জাহ্নবী। অত্যধিক আদরে মানুষ হয়েছিলেন তিনি। হিন্দু কলেজে পাঠরত অবস্থায় তাঁর সহপাঠী ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক। বিলেত গিয়ে ইংরেজিতে কবিতা লিখে কবিখ্যাতি পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর ১৮৩৪ এর ৯ ফেব্রুয়ারি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেন। এরপর বিশপ কলেজে ভর্তি হন। পরে মাদ্রাজে গিয়ে শিক্ষকতার কর্মগ্রহণ করেন। সেখানে নীলকর-কন্যা রেবেকা অক্টাভিসকে বিবাহ করেন। 'Madras Circulator' পত্রিকায় *A vision* এবং *Captive Ladie* প্রকাশিত হয় Timothy Penpoem ছদ্মনামে। ১৮৪৯ এই তাঁর গ্রন্থ *The Captive Ladie* এবং *Vision of the past* প্রকাশিত হয়। তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ পড়ে বেথুন সাহেব তাঁকে বাংলাতে সাহিত্যচর্চা করার পরামর্শ দেন। ১৮৫৬ সালে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছিল এবং ফরাসী অধ্যাপকের দুহিতা হেনরিয়েটাকে বিয়ে করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যচর্চাতেই তিনি কবি ও নাট্যকার হিসেবে সাফল্য পান। ব্যারিস্টারি পড়তে ১৮৬২তে বিদেশযাত্রা করেন, ১৮৬৭তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ঋণগ্রস্ত অবস্থায় বিদেশে ও স্বদেশে বিদ্যাসাগরের আনুকূল্য তিনি পেয়েছিলেন। শেষ জীবনে দারিদ্র্য ও অসুস্থতা তাঁর সঙ্গী ছিল। ২৯ জুন, ১৮৭৩ মধুকবির জীবনাবসান হয়।

৮.১.২ সাহিত্যকীর্তি : প্রথম জীবনে ইংরেজি সাহিত্যচর্চা করলেও মাতৃভাষাতেই তাঁর কবি ও নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি আসে। বাংলা নাটকের ইতিহাসেও মধুসূদন যুগান্তকারী প্রতিভা হিসেবেই চিহ্নিত হবেন। আমরা এই উপ-এককে অবশ্য কবি মধুসূদনকে নিয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। তাঁর প্রথম বাংলা কাব্য *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* (১৮৬০)।

পুরাণ ও মহাভারত থেকে তিনি কাহিনির উপাদান নেন। কাহিনিটি হল— সুন্দ-উপসুন্দ এই দুই ভাই দেবতাদের বিতাড়িত করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। বিষ্ণুর পরামর্শে দেবতারা নিজেদের মিলিত তেজ দিয়ে সৃষ্টি করেন মোহিনী তিলোত্তমাকে। তিলোত্তমার অধিকার নিয়ে দুই ভাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে নিহত হল এবং দেবতারা স্বর্গরাজ্য ফিরে পেলেন। চার সর্গে কাব্যটি বিভক্ত। ধবলশিখর, ব্রহ্মপুরীতোরণ, সম্ভব আর বাসববিজয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই কাব্য লিখে তিনি বাংলাসাহিত্যে আলোড়ন ফেলে দিলেন কারণ এতদিন ভাবা হত বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ সম্ভব নয়। যদিও পদ্মাবতী নাটকে কলির একটি সংলাপে মধুসূদন প্রথম এই ছন্দের প্রয়োগ করেন। *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১) বাংলায় প্রথম ও একমাত্র সার্থক মহাকাব্য। মোট তিনদিন ও দুইরাত্রির ঘটনা নয়টি সর্গে গ্রথিত হয়েছে। অভিষেক, অস্ত্রলাভ, সমাগম, অশোকবন, উদ্যোগ, বধ, শক্তিনির্ভেদ, প্রেতপুরী, সংস্ক্রিয়া— এই নয়টি সর্গ। রাবণ ও চিত্রাঙ্গদার পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুতে মেঘনাদকে সেনাপতিপদে বরণ দিয়ে শুরু হচ্ছে কাব্য। তারপর কপট-যুদ্ধে লক্ষ্মণের হাতে তার মৃত্যু, শোকাহত রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণের প্রাণসংশয় এবং মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে কাহিনির

শেষ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাকাব্যের অনুসরণ মেঘনাদ বধ কাব্যে চোখে পড়ে। তার সঙ্গে আছে উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদ, নারী জাগরণের ছবিও। রাবণ ও মেঘনাদ চরিত্র, রাম ও রাবণের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মধুকাব্যে কারণ রামেরা পররাজ্য-আক্রমণকারী এবং রাবণেরা দেশরক্ষায় যুদ্ধরত। বিভীষণ দেশদ্রোহী। প্রমীলা, মন্দোদরী, চিত্রাঙ্গদা, সীতা, সরমা— এইসব নারীচরিত্রগুলি আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। বীররসের কাব্য লিখতে গেলেও কাব্যে করুণরস-ই প্রধান হয়ে উঠেছে। *মেঘনাদবধ* থেকে রাবণের শোক উদ্ধৃত করা যাক :

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি— বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমাকে।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১) ওড বা গীতিকবিতা। রাধার বিরহবেদনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল কাব্যটি, রাধাকৃষ্ণের মিলন দিয়ে কাব্য শেষের পরিকল্পনা থাকলেও তা আর কার্যকর হয়নি। কৃষ্ণবিরহে রাধার বেদনা ও বিভিন্ন ভাবকে কবি কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। যদিও আঠারোটি কবিতার মধ্যে বারোটিতেই প্রকৃতি প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছে। বাংলায় এ ধরনের গীতিকবিতার জনকও মধুকবি। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে মিত্রাক্ষর দেখা যায়—

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা?

বৈষ্ণবকবিদের মতোই মধুকবি ভণিতা ব্যবহার করেছেন—

মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, এই লাগে মোর মনে—
ভূতলে অতুল মাণ শ্রীমধুসূদন।

কবি মধুসূদনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে বীরাঙ্গনা কাব্যে (১৮৬২)। ইতালীয় কবি Publius Ovidius Naso বা Ovid এর *Heroides* কাব্যের অনুপ্রেরণায় এই কাব্য রচিত হয়। বীরাঙ্গনা পত্রকাব্য। ওভিদের মতো একুশটি পত্র লিখতে চাইলেও মধুসূদন শেষপর্যন্ত এগারোটি পত্র লেখেন। এগারোজন নারীদের মধ্যে তারা, শূর্পণখা আর উর্বশী যথাক্রমে তাদের প্রেমিক সোম, লক্ষ্মণ ও পুরুরবাকে প্রেমনিবেদন করেছেন। দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণীও প্রেমপত্র। দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, দশরথের প্রতি কেকয়ী, শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা এবং নীলধ্বজের প্রতি

জনা— এই সাতটি স্বামীদের কাছে স্ত্রীদের চিঠি। এর মধ্যে জনা ও কৈকেয়ীর পত্রে স্বামীদের প্রতি তীব্র অনুযোগ আছে। ভারতীয় পুরাণের কাহিনি আর পাশ্চাত্যসাহিত্যের আদর্শে রচিত বীরাঙ্গনা কাব্যেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের সফলতম প্রয়োগ দেখা যায়। ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয় *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*। চতুর্দশপদী বলতে মধুসূদন সনেটকে বুঝিয়েছিলেন, বাংলায় সনেটেরও প্রবর্তক তিনিই। এই সনেটগুলির প্রায় সবই সুদূর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে লেখা। এই সনেটগুলিতে বাংলার প্রকৃতি, উৎসব, সমাজ বিষয় হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক ব্যক্তি, প্রাচীন, সাহিত্য, দেশি-বিদেশি সাহিত্যিকদের নিয়েও সনেট লিখেছেন তিনি। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে লেখা সনেটটিতে তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে—

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,

দীন যে, দীনের বন্ধু!

ইংরেজিতে বিখ্যাত কবি হবার স্বপ্ন সফল হয়নি। কিন্তু এই বিস্ময়প্রতিভা মাত্র কয়েক বছরের বাংলাসাহিত্য সাধনায় যে সম্পদ রেখে গেছেন তা তাঁকে বাঙালি মানসে চিরস্থান দিয়েছে।

একক ৮.২ নবীনচন্দ্র সেন

৮.২.১ জীবন : নবীনচন্দ্র সেন ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১০ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের নয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ. এবং জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন (বর্তমানে স্কটিশচার্চ কলেজ) থেকে বি.এ. পাশ করেন। বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হিসেবে বাংলা-বিহারের নানাস্থানে কাজ করেছেন। তাঁর আত্মকথা *আমার জীবন* ব্যক্তি মানুষটিকে জানতে খুব জরুরি। ১৯০৯ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

৮.২.২ সাহিত্যকীর্তি : তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থ *অবকাশরঞ্জিনী* দুই খণ্ডে বের হয়। প্রথম খণ্ডে (১৮৭১) আছে ২১টি কবিতা। ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে লেখা কবিতাগুলিতে পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব আছে। তবে গীতিকবিতা রচনায় নবীন কবির দক্ষতা দেখা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৭৮) আছে ৪৩টি কবিতা। এখানে সমসাময়িক ঘটনাকেও কবিতার বিষয় করেছেন।

তাঁর কবিখ্যাতি প্রতিষ্ঠালাভ করে ঐতিহাসিক গাথা কাব্য *পলাশীর যুদ্ধ* (১৮৭৬) প্রকাশের পর। পাঁচ সর্গে লেখা কাব্যের প্রথম সর্গে আছে সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে জগতশেঠদের ষড়যন্ত্র। দ্বিতীয় সর্গের বিষয় ব্রিটিশ শিবিরে চিন্তামগ্ন ক্লাইভকে দেবী ব্রিটানিওয়ার আশ্বাস। তৃতীয় সর্গে যুদ্ধের পূর্বরাত্রিতে সিরাজের আতঙ্ক আর ক্লাইভের সংশয় বিষয় হয়েছে। চতুর্থ সর্গে পলাশীর যুদ্ধ, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং মোহনলালের খেদ— ঘটনাপরম্পরায় এসেছে। পঞ্চম সর্গে বিজয়ী ইংরেজদের উল্লাস, সিরাজের হত্যা প্রধান বিষয়। *পলাশীর যুদ্ধ* খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল যদিও প্রথম শ্রেণির কাব্য হয়ে উঠতে পারেনি।

রণক্ষেত্রে আহত মোহনলালের কাতরোক্তির নমুনা—

কোথা যাও, ফিরে চাও সহস্রকিরণ।
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে দেব, করিলে গমন
আসিবে যবনভাগ্যে বিষাদ রজনী।

মিশরে রাণী, সিজার ও মার্ক অ্যান্টনির প্রিয়া ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে *ক্লিওপেট্রা* নামে একটি ক্ষুদ্র কাব্য লেখেন ১৮৭৭ সালে। আধুনিক মন নিয়ে কবি ক্লিওপেট্রার বাচনে কাব্যটি বিবৃত করেছেন। যদিও রচনারীতিতে শৈথিল্য দেখা যায়।

চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি অঞ্চলের পটে লেখেন গাথাকাব্য *রঙ্গমতী* (১৮৮০)। সামন্তপুর, বীরেন্দ্র, সপত্নীর অত্যাচারে নিরুদ্দিষ্ট মাতার খোঁজে বহুস্থান ঘোরে। মোগলবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধবিদ্যা শেখে। শিবাজীর কাছে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে স্বদেশে ফিরে আসে। কিন্তু পিতৃব্য মর্কট রায়ের ষড়যন্ত্রে মাতা বা বাল্যপ্রণয়ী কুসুমিকা কারও সঙ্গেই সাক্ষাত হল না এবং শোকার্তাবস্থায় তার মৃত্যু হল। সেই শোকে কুসুমিকাও প্রাম দিল। মাতা, যিনি সন্ন্যাসিনী হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি শোকে পাগল হয়ে রঙ্গমতীর ঘরে ঘরে অগ্নিসংযোগ করলেন। এই সুযোগে পর্তুগিজ দস্যুদের আক্রমণে রঙ্গমতীর পতন ত্বরান্বিত হল। ট্র্যাজিক এই কাব্যও খুব সার্থক হয়নি। বাংলা মহাকাব্যের ধারায় নবীনচন্দ্র ত্রয়ী মহাকাব্য লেখেন কৃষ্ণকে নায়ক করে। প্রথম ভাগ *রৈবতক* (১৮৮৭)-এ দেখানো হয়েছে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ দুর্বাসা আর নাগরাজ বাসুকির একত্র হওয়া, দুর্বাসার বাসুকির ভগিনী জরতকারুকে বিবাহ, জরতকারুর গোপন কৃষ্ণপ্রেম যা পরে প্রতিচহিংসার রূপান্তরিত, বিপরীতে শৈলজার অর্জুনের প্রতি শত্রুতার প্রেমে রূপান্তর, অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহ— এইসব ঘটনা। দ্বিতীয় ভাগ *কুরুক্ষেত্র* (১৮৯৩)-এ প্রধান ঘটনা অভিমন্যু বধ। যদিও দর্শনভাবনার সঙ্গে আবেগের অতিরেক কাব্যাংশটিকে দুর্বল করে তুলেছে। শেষ ভাগ *প্রভাস* (১৮৯৬)-এ যদুবংশ ধ্বংস এবং জরতকারুর হাতে কৃষ্ণের হত্যা বর্ণিত হয়েছে। কবি সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ভাবনা থেকে যুগে যুগে কৃষ্ণের অবতার রূপে খ্রিস্ট-হজরত মহম্মদ-চৈতন্যদেবকে বর্ণনা করেছেন। বলরামকে হারকুলেশ (Hercules) নামে য়ুরোপ পাঠিয়েছেন। পুরাণ-মহাভারতের উপর তাঁর নিজস্ব কল্পনা ত্রয়ীকাব্যকে অভিনবত্ব দিয়েছিল। কোথাও কোথাও সেই কল্পনা উদ্দাম এবং কাহিনির ঐক্য রক্ষায় ব্যর্থ। এই ত্রয়ী মহাকাব্য নবীনচন্দ্রের প্রধান কীর্তি কিন্তু মনে রাখতে হবে মধুসূদন ছাড়া গীতলতা-সিক্ত বাংলাদেশে কোন কবিই মহাকাব্য রচনায় সফল হননি। তবু ব্যর্থ মহাকবি হলেও হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের স্থান স্বতন্ত্র।

পদ্যে যিশুখ্রিস্টের জীবন নিয়ে *খৃষ্ট* (১৮৯১), বুদ্ধদেবের জীবন নিয়ে *অমিতাভ* (১৮৯৫) এবং চৈতন্যদেবের জীবন নিয়ে *অমৃতাভ* (১৯০৯) তাঁর অন্যতম কবি-কীর্তি। এছাড়াও তিনি পদ্যে গীতা (১৮৯৯) এবং মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ করেন। মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য, জীবনীকাব্য— অনেক ধরনের কাব্য রচনা করলেও গীতিকবিতাতেই তিনি বেশি সার্থক। তাঁর প্রতিভাতে মুগ্ধ পাঠক-সমালোচকেরা তাঁকে বাংলার

বাইরন বলতেন।

একক ৯ বিহারীলাল চক্রবর্তী

৯.১ জীবন : ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ মে কবির জন্ম। পিতা দীননাথ চক্রবর্তী ছিলেন পূজারী ব্রাহ্মণ। কিছুদিন জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজ) এবং সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। প্রথাগত না হলেও সঙ্গীতচর্চাও করেছেন কবি। উনিশ বছরে প্রথম বিবাহ। পত্নীর অকালমৃত্যুর পর পঁচিশ বছরে দ্বিতীয় বিবাহ করেন কবি। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ ছিল। প্রসঙ্গত পরবর্তীকালে (তাঁর মৃত্যুর সাত বছর পর ১৯০১ সালে) তাঁর পুত্র শরৎকুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা বা মাধুরীলতার বিবাহ হয়। ১৮৫৯ সালে *পূর্ণিমা* নামে একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। এরপর বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে *সাহিত্য সংক্রান্তি* পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৬৩ এবং পরে ১৮৬৭তে *অবোধবন্ধু* পত্রিকার প্রথমে পৃষ্ঠপোষক ও পরে স্বত্বাধিকারী ছিলেন তিনি। বেহারীলাল নাম হলেও বিহারীলাল নমেই তিনি পরিচিত হয়েছেন। ১৮৯৪ সালের ২৪ মে বহুমূত্র রোগে তাঁর জীবনাবসান হয়।

৯.২ সাহিত্যকীর্তি : গদ্যরূপক কাব্য *স্বপ্নদর্শন* তাঁর প্রথম গ্রন্থ (১২৬৫)। ১৮৬২তে বের হল *সঙ্গীতশতক* বাংলার দীর্ঘদিনের গীতিকবিতার ধারাকেই তিনি ফিরিয়ে আনলেন এই গ্রন্থে। সুরতানের নির্দেশ থাকলেও বা নাম *সঙ্গীতশতক* হলেও রচনাগুলিতে গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্য *বন্ধুবিয়োগ* (১৮৭০) চার সর্গে গ্রথিত কাব্যটি পয়ারে লেখা। প্রিয়তমা পত্নী ও তিন বাল্যবন্ধুর স্মরণে লেখা কাব্য। *নিসর্গসন্দর্শন* (১৮৭০) সাত সর্গে লেখা। ১৬ কার্তিক, ১২৭৪ বঙ্গাব্দে রাতে যে ভয়ঙ্কর ঝড় জনজীবন বিপর্যস্ত করেছিল সেই ঝড় তাঁর কাব্যের শেষাংশের বিষয়। প্রথম সর্গে কবির চিন্তা আর দ্বিতীয় সর্গে সমুদ্রদর্শন বিষয় হয়েছে। তৃতীয় সর্গে আছে ঝড়ের মধ্যে দুর্বৃত্তের কবলে পড়া এক গৃহবধূর অসমসাহসের কথা। সেই বীরাঙ্গনা খাঁড়া ধরে একজনকে কেটে ফেললে দস্যুদলের অন্যরা পালিয়ে যায়। চতুর্থ সর্গে নভোমণ্ডল, পঞ্চম সর্গে ঝটিকার রচনী, ষষ্ঠ সর্গে ঝটিকাসম্ভোগ এবং শেষ সর্গে পরদিনের প্রভাত বিষয় হিসেবে এসেছে। স্বদেশপ্রেম তাঁর এই কাব্যের নিসর্গ-বর্ণনার ফাঁকেও এসেছে—

কপটে অনাসে এসে রাক্ষস দুর্বার
হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা সীতা।

বঙ্গসুন্দরী-তে (১৮৭০) নটি সর্গে লেখা হলেও ১৮৮০ সালের দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে তৃতীয় সর্গ সুরবালা যুক্ত হওয়াতে এটি দশ সর্গ হয়। প্রথম সর্গ উপহারে আছে কবিচিত্তের হাহাকার, এই অবস্থায় সখার প্রণয় তাঁর দাহ মেটাতে পারে, যে সখাকে তিনি কাব্যখানি উপহার দিতে চান। দ্বিতীয় সর্গ নারীবন্দনা। তৃতীয় সর্গে সুরবালার কাহিনি। কবি-সখার সুরবালার প্রতি স্বর্গীয় প্রেম, সুরবালা তাঁর কাছে মানসপ্রতিমা। চতুর্থসর্গ চিরপরাধিনী, পঞ্চম সর্গ করুণাসুন্দরী, ষষ্ঠ সর্গ বিষাদিনী, সপ্তম সর্গ প্রিয়সখী, অষ্ট সর্গ বিরহিনী, নবম সর্গ প্রিয়তমা আর দশম সর্গ অভাগিনী। প্রতিটি সর্গেই বঙ্গনারীর বিভিন্ন অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন

কবি। প্রেম-দুঃখ-করুণা-বিরহ-বিষাদ মাখা নারীপ্রতিমাগুলি কবির হাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

প্রেমপ্রবাহিণী (১৮৭০)তে পাঁচটি সর্গ। পয়ারে গাঁথা। প্রেমিকার অধঃপতন দেখে প্রেমিক পুরুষের মনে হয়, সংসারে প্রেমের মর্যাদা নেই। তখনই কবিচিত্তের জাগরণ ঘটে। বিরাগ, বিষাদ, অন্বেষণ এবং নির্বাণের পর কবি অনুভব করলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রেমানন্দময়তা।

বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য *সারদামঙ্গল* বের হয় ১৮৭৯ সালে। পাঁচটি সর্গে গ্রথিত। কবিচিত্তে কাব্যদেবী যেভাবে উপস্থিত হয়েছেন, তাই কবি কাব্যের বিষয় করেছেন। ভাবের আতিশয্য এবং রূপকের উপস্থাপনায় কাব্য অনেকক্ষেত্রেই দুরূহ হয়েছে। বিশ্বের জীবধাত্রী ঊষা-গায়ত্রীরূপে যে কাব্যলক্ষ্মীর প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল। বৈদিক যুগ থেকে বাল্মীকির যুগ ও পরে কালিদাসের যুগ— তিন যুগে তিনি ত্রিবিধ সরস্বতী মূর্তি কল্পনা করেছিলেন। প্রথম সর্গে কবিহৃদয়ে কাব্যলক্ষ্মীর দর্শন পান দুই রূপে— আনন্দলক্ষ্মী আর বিষণ্ণ করুণাময়ী। বরহী কবির সান্ত্বনা জাগে মৃত্যুর পর কবির ভস্মরাশি বা হাড়ের মালা দেখেও দেবীর করুণা জাগবে। সর্গে আছে আনন্দলক্ষ্মীর উদ্দেশ্য কবিচিত্তের অভিসার। তৃতীয় সর্গে সংশয়, চতুর্থ সর্গে এসে হিমালয়ের মধ্যে আশ্বাস অন্বেষণ আর পঞ্চম সর্গে বাঞ্ছিতার দেখা পেয়ে আনন্দ অনুভব— এভাবেই কাব্যের গ্রন্থনা। রোমান্টিক রহস্যময়তায় গড়ে ওঠা এই কাব্যে সে অর্থে আখ্যান বলে কিছু নেই। কবিহৃদয়ের অনুভূতি নিয়েই এই কাব্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী কবিকে একটি পশমের আসন বুনে সেখানে সারদামঙ্গলের ছত্র তুলে লিখে দেন—

হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দুনয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও?

কাব্যে ভক্তপাঠিকার প্রশ্নের উত্তর দেবার সংকল্প থাকলেও প্রথমে মাত্র তিনটি স্তবক রচনা করেছিলেন। পরে কাদম্বরীর আকস্মিক প্রয়াণে ব্যথিত কবি সাধের আসন কাব্যসমাপ্ত করেন। দশ সর্গের এই কাব্যে কবি উত্তর দিয়েছেন—

ধেয়াই কাহারে দেবি নিজে আমি জানিনে।

সাধের আসনকে সারদামঙ্গলের উপসংহার বলা যেতে পারে। সাদের আসনেও কাহিনি সুগঠিত হয়নি, তবে রূপক সারদামঙ্গলের মত অস্পষ্টও নয়।

কবি এছাড়াও *মায়াদেবী* নামে একটি ক্ষুদ্র কাব্য (১৮৮২), কয়েকটি খণ্ড কবিতা নিয়ে শরৎকাল, *ধুমকেতু* (১৮৮২), *দেবরাণী* (১৮৮৭) নামে কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন। বাউলগানের সংকলন বাউলবিংশতি ১৮৮৭ সালে বের হয়। প্রেম, প্রকৃতি, নারী ও সৌন্দর্যকে নিজের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির রসে জারণ করে গীতিকবিতার আধুনিক রূপ দিলেন বিহারীলাল। নিজের ছন্দে, নিজের মনে কথা বললেন। 'উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি' নিজের সুরে গান ধরেছিল। রবীন্দ্রনাথও বিহারীলালকে এভাবেই

তাঁর কাব্যপ্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

একক ১০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০.১ জীবন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮তে (৭ মে, ১৮৬১) কলকাতার জোড়াসাঁকোতে বিখ্যাত ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম পথিকৃৎ। মা সারদা দেবী। পিতামহ দ্বারকানাথ ছিলেন স্বনামধন্য। মা-বাবার পঞ্চদশ সন্তানের মধ্যে চতুর্দশ সন্তান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল আকাদেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স— নানা বিদ্যালয়ে পড়লেও বিদ্যালয়ের পড়াশোনার ছকবাঁধা পথে চলতে কবির মন সায় দেয়নি। বাড়িতে পড়াশোনা আর সঙ্গীতের শিক্ষা চলতে থাকল। বাড়িতে অবশ্য সাহিত্যচর্চা ও সঙ্গীতচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ পেয়েছিলেন কবি। তাঁর দাদারাও ছিলেন স্বনামধন্য— দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর ছিল রবীন্দ্রনাথের বড়ো হয়ে ওঠার পেছনে অনেক অবদান। ১৮৭৮ সালে কবির প্রথম বিলাতযাত্রা। ব্রাইটনে পাবলিক স্কুল বা লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে পড়লেও দেড় বছরের মধ্যে সেখান থেকে দেশে ফিরে এলেন কবি। আবার ব্যারিষ্টারি পড়াতে বিলাত পাঠানোর চেষ্টা হলেও মাদ্রাজ থেকেই ভাগ্নে সত্যপ্রসাদের জন্যে প্রত্যাবর্তন করতে হয় তাঁকে। এইসময় তাঁর সাহিত্য-সঙ্গীত চর্চা পুরোদমে চলছিল।

১৮৮৩ সালে যশোহরের বেণীমাধব রায়চৌধুরীর মেয়ে ভবতারিণীর সঙ্গে বিবাহ, বিয়ের পর তাঁর নাম হল মৃণালিনী। ১৮৯১ এ শান্তিনিকেতনে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ১৩০৮ সালের ৭ পৌষ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল ব্রহ্মচর্যাশ্রম। মাত্র পাঁচটি ছাত্র নিয়ে শুরু হয়ে গেল বিদ্যালয়। ১৯০২এ পত্নীবিয়োগ হয়। পরের বছর মেজ মেয়ে রেণুকার মৃত্যু হয়। পিতৃহারা হন ১৯০৫ সালে, কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ১৯০৭ সালে। পারিবারিক জীবনে পরপর মৃত্যুর আঘাত কবিকে সহ্য করতে হয়। এর মধ্যেই সমানতালে চলেছে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাধনা, জমিদারির কাজ, বিদ্যালয়ের কাজ, ব্রাহ্মসমাজের কাজ। ১৯১০এ নিজপুত্র রথীন্দ্রনাথের বিধবাবিবাহ হয় প্রতিমা দেবীর সঙ্গে। ১৯১৩তে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন তাঁর কবিতাবলির ইংরেজি অনুবাদ *সঙ-অফারিঙস* এর জন্যে। ভারতবর্ষের প্রথম নোবেল-প্রাপক এবং সাহিত্যে প্রথম এশিয়ার কেউ এই নোবেল পেলেন। দেশ-বিদেশে তিনি অনেক সম্মানে ভূষিত হয়েছে। ১৯১৮তে জ্যেষ্ঠ কন্যা মাধুরীলতার মৃত্যু হয়। ১৯১৯এ জালিয়ানওয়ালাবাগের গণহত্যার প্রতিবাদে স্যার উপাধি ত্যাগ করেন। ১৯৩০এ প্যারিসে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। ১৯৩৭এ প্রাণসংশয়-পীড়াতে প্রায় দুদিন সংজ্ঞাহীন। ১৯৪০এ কালিম্পঙে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ (৭ আগস্ট, ১৯৪১) তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

১০.২ সাহিত্যকীর্তি : সাহিত্যের এমন কোনো দিক নেই যেখানে রবীন্দ্রপ্রতিভার স্পর্শ নেই। চিত্রকলা, সঙ্গীত, অভিনয়েও তিনি অদ্বিতীয়। আমাদের এই এককে অবশ্য আলোচ্য-কবি রবীন্দ্রনাথ। শৈশব থেকেই তাঁর কবিতারচনা শুরু। ১২৮১ সালে হিন্দুমেলায় পঠিত *হিন্দুমেলার উপহার* কবিতাটি ওই সালের ১৪ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫) *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় মুদ্রিত হয়। তাঁর নামে প্রকাশিত প্রথম কবিতা এটি। তাঁর আগে দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের লেখা 'অভিলাষ' কবিতাটি তাঁর লেখা মনে করা হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী নাটকের 'জ্বল জ্বল চিতা! দ্বিগুণ দ্বিগুণ' এবং পুরুবিক্রম নাটকের 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গান দুটি তাঁর লেখা।

পৃথ্বীরাজের পরাজয় বলে শৈশবে একটি বীররসাত্মক কাব্য লেখার কথা কবি বলেন, যদিও তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য *বনফুল* (১৮৮০)। যদিও গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় *কবিকাহিনী* (১৮৭৮)। *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী* (১৮৮৪), *ভগ্নহৃদয়* (১৮৮১), *শৈশব সঙ্গীত* (১৮৮৪) তাঁর প্রথম পর্বের ফসল। যদিও গ্রন্থাকারে পরে প্রকাশিত হয় তবু আদিপর্বে এগুলি রচিত। *ভগ্নহৃদয়* কাব্যকে স্বীকৃতি দেন ত্রিপুরায় রাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য। *সন্ধ্যাসঙ্গীত* (১৮৮২) থেকে রবীন্দ্রকবিতার প্রথম স্বকীয়তার উজ্জ্বল চিহ্ন পাওয়া গেল। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কবিকে প্রশংসা করেন।

রবীন্দ্রকাব্যের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হচ্ছে *সন্ধ্যাসঙ্গীত* থেকেই। *প্রভাত সঙ্গীত* (১৮৮৩), *ছবি ও গান* (১৮৮৪), *কড়ি ও কোমল* (১৮৮৬) পর্যন্ত বলা যেতে পারে এই দ্বিতীয় পর্ব। কবির হয়ে ওঠার এই পর্ব, অনেকে তাই উন্মেষ পর্ব বলেন। *প্রভাত সঙ্গীতের* 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' থেকে কবিচিত্তের এক নতুন অনুভব শুরু হল। *ছবি ও গান* গ্রন্থে প্রকৃতি আর মানবজীবনের সৌন্দর্যকে উপভোগ করেছেন কবি। *কড়ি ও কোমলে* এসে এই উপভোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইন্দ্রিয়বাসনা।

মানসী (১৮৯০) কাব্যগ্রন্থে এসে কবির সঙ্গে শিল্পীর সার্থক-মিলন হল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারাজীবনে কবি হিসেবে নিজেকে বারবার বদলেছেন, বারবার গতি পরিবর্তিত হয়েছে তাঁর কাব্যধারার। নদীর বাঁক-ফেরার সঙ্গে আধুনিকতার তুলনা করেছিলেন তিনি, এই বাঁক তাঁর কাব্যে বারবার এসেছে বলেই তিনি চিরনতুন, চির-আধুনিক। বিশ্বকবি, কবিগুরু। মানসী এরকম এক বাঁক। ১৮৮৭-১৮৯০এ লেখা কবিতাগুলিকে নিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৯০ সালে। কবিতাগুলিতে প্রেম ও প্রকৃতির পাশাপাশি স্বদেশ ও সমাজ উঠে এসেছে। আছে সমালোচকদের প্রতি কবির মনোভাবের কথাও।

এরপরের কাব্য *সোনার তরী* (১৮৯৪)-তে রূপকের সার্থক ব্যবহার পাওয়া যায়। সৌন্দর্য, প্রেম, প্রকৃতি, বিশ্ববোধ, মৃত্যুচেতনা, রূপকথা, কাহিনিকবিতা— এসবের সহাবস্থান নিয়ে *সোনার তরী* উল্লেখযোগ্য কাব্য হয়ে উঠেছে। এইসময় কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্পদের সোনার তরীতে স্থান পেল—

চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালী (১৮৯৬), কণিকা (১৯০০), কথা ও কাহিনী (১৯০০), কল্পনা (১৯০০),

ক্ষণিকা (১৯০০), নৈবেদ্য (১৯০২), স্মরণ (১৯০৩), শিশু (১৯০৩), উৎসর্গ (১৯০৪), খেয়া (১৯০৬)।

কবিজীবনের চরম বিকাশের এই পর্বের মানসী থেকে *চৈতালী* কাব্য পর্যন্ত একটি স্তর, *কণিকা* থেকে *খেয়া* পর্যন্ত পরের স্তর। *সোনার তরী*-র মানসসুন্দরী *চিত্রা*-তে জীবনদেবতা। চৈতালীতে ঐতিহ্যচেতনা অন্যমাত্রায় পৌঁছে গেছে। কণিকা একশ দশটি ছোটো কবিতার সংকলন, সুকুমার সেনের ভাষায় 'বাংলায় অভিনব চাণক্যশ্লোক'। *কণিকা*-র একটি কণিকা উদ্ধৃত হল—

মাঝারির সতর্কতা
উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে

কথা ও কাহিনী-তে আখ্যানকবিতার আর কাব্যনাট্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাই।

কল্পনা-তে স্থান পেয়েছে ৪৯৮টি কবিতা ও গান। *ক্ষণিকা* লঘু কৌতুকের ভঙ্গিতে দলবৃত্ত রীতিতে লেখা। সহজ সুরে জীবনের গভীর কথা ফুটে উঠেছে।

মনেরে তাই কহো যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যের লও সহজে (বোঝাপড়া)

নৈবেদ্য-এ প্রার্থনা, অধ্যাত্ম-অনুভব বড়ো স্থান পেয়েছে। বুয়র যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔদ্ধত্যের প্রতি ক্ষোভ আছে। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুশোকজনিত বেদনার প্রকাশ স্মরণ কাব্য। শিশু কাব্যে শিশুমনের কল্পনা আর কবিকথকের বাৎসল্য দুইই স্থান পেয়েছে। মোহিতচন্দ্র সেন যে রবীন্দ্রকাব্য গ্রন্থাবলী সম্পাদনা করেন সেখানে কবিতাগুলিকে বিভিন্ন বিভাগ রাখা হয়েছিল। প্রতিটি বিভাগের ভাব-প্রকাশক কবিতা লেখেন স্বয়ং কবি, সেগুলিই মূলত উৎসর্গে কবিতা। খেয়া কাব্যে অধ্যাত্ম-অনুভূতির অনন্য প্রকাশ ঘটেছে। রহস্যময়তা কবিতাগুলির সম্পদ হয়ে উঠেছে।

এরপর *গীতাঞ্জলি* (১৯১১), *গীতিমাল্য* (১৯১৪) এবং *গীতালি* (১৯১৫) তিনটি কাব্য নিয়ে কবিজীবনের সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্ব পাই। গান ও কবিতার মেলবন্ধনে অধ্যাত্মভাবনা, রহস্যময়তা, জীবনপ্রীতি একাকার হয়ে গেছে।

বলাকা (১৯১৬) রবীন্দ্রকাব্যের আরেক বাঁক। ছন্দের দিক থেকে দেখা যায় মুক্তবন্ধ বা মুক্তক ছন্দের ব্যবহার করেছেন কবি। তিনি এই ছন্দ সম্পর্কে বলেছেন পয়ারের বেড়াভাঙা। ফরাসী দার্শনিক বেঁগসের গতিবাদ তত্ত্ব কবিকে আকৃষ্ট করেছিল। বলাকার প্রদান অবলম্বন গতিবাদ, তবে রবীন্দ্রকাব্যে গতির সঙ্গে স্থিতিও সমান সত্য। প্রসঙ্গত রবীন্দ্র কাব্যে সীমা-অসীম, রূপ-অরূপ, পূর্ণ-অপূর্ণ, খণ্ড-অখণ্ড, জীবন-মৃত্যু,

গতি-স্থিতি— এই বিপরীত যুগ্মকের সার্থক ব্যবহার পাই। *পলাতকা*-তেও ছন্দে এই মুক্তি আছে। এই জগত ও মানবজীবনের একান্ত অনুভব এই কাব্যে ফুটে উঠেছে। শিশু *ভোলানাথ* (১৯২২)-এ শিশুকাব্যের মতোই শৈশবকে বিষয় করেছেন। এর মধ্যে লিখছেন *লিপিকা* গ্রন্থ। যে গ্রন্থের (১৯২২) কবিতাগুলির মধ্যে প্রথম গদ্যকবিতার সূত্রপাত হচ্ছে। *পূরবী* (১৯২৫)-তে জীবন-মৃত্যুর দ্যোতনায় জীবনের প্রতি গভীর সংরাগ ও না পাওয়ার বেদনা বিবৃত হয়েছে। *লেখন* (১৯২৭) কতকগুলি ছোটো কবিতার সংকলন, যা মূলত চীন-জাপান যাত্রার সময় অটোগ্রাফের জন্যে লেখা। *মহুয়া* (১৯২৯) কাব্যের প্রেমভাবনা প্রাধান্য পেয়েছে।

রবীন্দ্রকাব্যের পরের বাঁক পাই *পুনশ্চ* কাব্যগ্রন্থ (১৯৩২) থেকে। তার আগে লিখছেন *বনবাণী* (১৯৩১) *পরিশেষ* (১৯৩২)। *বনবাণী*-তে ঋতুরঙ্গ আর প্রকৃতিপ্রেম প্রধান হয়েছে। *পরিশেষ* থেকেই বলা যায় গদ্যকবিতার সূচনা। *লিপিকা*-র দ্বিধা এখানে আর নেই। পুনশ্চের সব কবিতাই গদ্যছন্দে লেখা। গদ্যকবিতার অন্য তিনটি বই হল— *শেষ সপ্তক* (১৯৩৫), *পত্রপুট* (১৯৩৫) এবং *শ্যামলী* (১৯৩৬)।

এর মধ্যে অবশ্য ৩১টি ছবি (তার মধ্যে তাঁর ছবি সাতটি) ও সেগুলি অবলম্বনে ৩১টি কবিতা নিয়ে *বিচিত্রিতা* প্রকাশিত হয় (১৯৩৩)। কবিতাগুলি পদ্যছন্দে লেখা। *বীথিকা* (১৯৩৫)ও পদ্যছন্দে লেখা। *শ্যামলী*-র আমি কবিতা থেকে গদ্যকবিতার নিদর্শন উদ্ধৃত করা হল—

আমারই চেতনা রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।

খাপছাড়া (১৯৩৭) ছড়ার ও ছড়ার ছবি (১৯৩৭)-ছড়া-কবিতার গ্রন্থ। শেষ পর্বের কাব্যগুলি হল—

প্রান্তিক (১৯৩৮), সেজুঁতি (১৯৩৮), প্রহাসিনী (১৯৩৮), আকাশপ্রদীপ (১৯৩৯), নবজাতক (১৯৪০), সানাই (১৯৪০), রোগশয্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১), শেষলেখা (১৯৪১)

কাব্যগুলিতে মৃত্যুচেতনা, মানবতাবোধ, চিত্রধর্মিতা উঠে এসেছে। মৃত্যুর পর *ছড়া* (১৯৪১), *শেষ লেখা* (১৯৪১), *স্ফুলিঙ্গ* (১৯৪৫), *বৈকালী* (১৯৫১) ও *চিত্রবিচিত্র* (১৯৫৪) প্রকাশিত হয়। বাংলা কবিতা তথা বাংলাসাহিত্যকে বিশ্বের কাব্যশ্রেণিতে পৌঁছে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বকবি বা কবিগুরু উপাধি তাঁর ক্ষেত্রেই

প্রযোজ্য যতদিন সাহিত্য থাকবে, পৃথিবীতে মানুষ থাকবে ততদিন স্বমহিমায় থেকে যাবেন তিনি।

একক ১১.১ : মোহিতলাল মজুমদার

১১.১.১ জীবন : ১৮৮৮ সালের ২৬ অক্টোবর অবিভক্ত ২৪ পরগনার হালিশহরে মোহিতলাল মজুমদারের জন্ম হয়। কলকাতার মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজে যুক্ত হন। বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী মানুষটি শিক্ষক, কবি ও সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে ছিলেন স্বনামধন্য। সমালোচক হিসেবে কবি *শ্রীমধুসূদন* (১৯৪৭), *সাহিত্যবিচার* (১৯৪৭), *বঙ্কিমবরণ* (১৯৪৯), *শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র* (১৯৫০) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সত্যসুন্দর দাস নামেও তিনি সাহিত্য সমালোচনা করেছেন। নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, বঙ্গভারতী পত্রিকা সম্পাদনাও করেন। ১৯৫২ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

১১.১.২ সাহিত্যকীর্তি : রবীন্দ্রনাথ থেকে বেরিয়ে এসে নতুন সৃষ্টির পথ খোঁজার বিষয়ে অগ্রদূত ত্রয়ীকবির একজন ছিলেন মোহিতলাল। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *দেবেন্দ্রমঙ্গল* (১৯২২)। কবির আত্মীয় সেই সময়ের বিখ্যাত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনকে প্রশস্তি করে ১৬টি সনেট লিখেছিলেন, তার সংকলন এই গ্রন্থ। ১৯২২এই প্রকাশিত হয় স্বপনপশারী। এই গ্রন্থের অঘোরপন্থী এর মতো কবিতা তাঁর অভিনবত্ব চিহ্নিত করে। নাট্যধর্মী কবিতায় তাঁর দক্ষতা এই গ্রন্থ থেকেই দেখা যায়। রক্ষণশীলতা থেকে জীবনে দেহের সীমানাকে তিনি অস্বীকার করেননি। তাই অনেকে তাঁকে দেহবাদী কবি বলেন। যদিও দেহাত্মবাদী কবি বলাই সঙ্গত। বলিষ্ঠ জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর *বিস্মরণী* কাব্যগ্রন্থ। *মোহমুদ্গার, পান্থ, কালাপাহাড়*— এইসব কবিতায় তাঁর নিজস্বতা খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৩৬এ প্রকাশিত হয় *স্মরগরল*। নাম কবিতাতে পাই, দেহাত্মবাদী কবির বলিষ্ঠ উচ্চারণ—

আমি মদনের রচিনু দেউল— দেহের দেউল পরে
পঞ্চশরের প্রিয় পাঁচ-ফুল সাজাইনু থরে থরে
দুয়ারে প্রাণের পূর্ণকুম্ভ—
পল্লবে তার অধর চুম্ব,
রূপের আবীরে স্বস্তিক তায় আঁকিব যত্ন ভরে

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পায় *হেমন্তগোধূলি*। ১৯৪১এ প্রকাশিত হয় তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ ছন্দ, চতুর্দশী। ইতিহাস ও পুরাণকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন তিনি। সনেট বা অনুবাদ কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। একদিকে তিনি ছিলেন রোমান্টিসজম আর ক্লাসিসিজমের মিলিত রূপকার। ধরণীর মিথ্যাপারাবারে দাঁড়িয়ে নিঠুর জীবন আর দুঃখবোধকেন্দ্রতিনি বাস্তবতা বলে মেনেছেন। তবে শুধু দুঃখের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, দুঃখের কারণ অনুসন্ধানেও ব্যাপৃত হয়েছেন। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

উত্তরকালের কবিরা আধুনিকতার প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের সলতে পাকানোর ক্ষেত্রে তাঁর ঋণস্বীকারে দ্বিধা করেননি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত *কল্লোল যুগ* গ্রন্থে তার স্বীকৃতি দিয়েছেন— 'মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম। (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, ডি.এম. লাইব্রেরি, ১৯৫৭ সংস্করণ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৩৪)

একক ১১.২ : নজরুল ইসলাম

১১.২.১ জীবন : নজরুল ইসলাম বর্ধমানের চুরুলিয়ায় ১৮৯৯ সালের ২৪ মে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কাজি ফকির আহমেদ, মাতা জাহেদা খাতুন। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে কবির বেড়ে ওঠা। তাঁর ডাকনাম ছিল দুখুমিঞা। মাত্র আট বছর বয়সে পিতাকে হারান তিনি। গ্রামের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা। অল্পবয়স থেকেই লেটোর দলে গান লিখতে শুরু করেন এবং ওস্তাদ হিসেবে খ্যাতিও পান। জীবিকা হিসেবে অনেক কাজই করতে হয়েছে তাঁকে।

১৯১৭ সালে রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে দশম শ্রেণিতে পাঠরত নজরুল সৈন্য হয়ে বাঙালি রেজিমেন্টে যোগ দিয়ে চলে গেলেন করাচি। সিয়ারসোলে তাঁর সহপাঠী ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশের পর নজরুলের কবিখ্যাতি বহুগুণ বেড়ে গেল। ১৯২২এ কবিগুরুর আশীর্বাণী নিয়ে বের করেন *ধূমকেতু* পত্রিকা। *আনন্দময়ীর আগমনে* লিখে ১৯২৩এ এক বছর কারাবরণ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বসন্ত নাটকটি উৎসর্গ করেন। তাঁর প্রথম স্ত্রী দৌলতপুরের সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস। তাঁর প্রথম বিয়ে সুখের হয়নি। দ্বিতীয় বিবাহ করেন আশালতা সেনগুপ্তাকে। ১৯২৫ সালে *লাঙল* পত্রিকা তাঁর পরিচালনাতে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার পরের বছর নাম হয় *গণবাণী*। ১৯৩৫এ মাতৃবিয়োগ হয়। তারপর ১৯৩৭-এ *প্রলয়শিখা* বাজেয়াপ্ত হয় এবং নজরুলের ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হয় যদিও তা কার্যকর হয়নি। ১৯৩৭-এই শিশুপুত্র বুলবুলের মৃত্যুতে কবি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। ১৩৩৯-এ স্ত্রী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। কবি জলের মত অর্থব্যয় করেন। ১৯৪০ সালে নবযুগের প্রধান সম্পাদক হন। ১৯৪২এ কবি নজরুল চিরদিনের মত তাঁর স্বাভাবিকত্ব হারান, স্তব্ধ হয়ে যায় কবির কলম। চিকিৎসার জন্যে ইংল্যাণ্ড ও জার্মানি নিয়ে গেলেও কোনো ফল হল না। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে কবিকে নিয়ে আসা হয়। তিনি হন বাংলাদেশের জাতীয় কবি। দুই বাংলাতেই নানাক্ষেত্রে রবীন্দ্র-নজরুল এই দুই নাম আবেগ এবং সম্মানের সঙ্গে একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬ সালে এপার বাংলার মাটিতেই কবির জীবনাবসান হয়।

১১.২.২ সাহিত্যকীর্তি : ১৯২২ সালে বের হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অগ্নিবীণা*। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি এ গ্রন্থেই স্থান পায়। ১৯২৩ সালে বের হয় *দোলনচাঁপা*। কবিতাগুলি ১৯২৩ সালে কারাবরণকালে জেলের

মধ্যেই লেখা। পরের কাব্যগ্রন্থ— *বিষের বাঁশী* (১৯২৪)। ১০ আগস্ট গ্রন্থ বের হয় আর ব্রিটিশ সরকার ২২ অক্টোবর গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেন। পরের কাব্যগ্রন্থ *ভাঙার গান* (১৯২৪)টিও বাজেয়াপ্ত হয়। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় *চিত্তনামা* (১৯২৫), *ছায়ানট* (১৯২৫), *সাম্যবাদী* (১৯২৫), *পুবের হাওয়া* (১৯২৬)। *চিত্তনামা* কাব্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তিরোধানে শোকাহত কবি 'অর্ঘ্য', 'অকালসন্ধ্যা', 'সান্ত্বনা', 'ইন্দ্রপতন' ও 'রাজভিখারী' নামে পাঁচটি কবিতায় দেশবন্ধুর জীবনকাহিনী বিবৃত করেছেন। *ছায়ানটে* প্রেমভাবনা গুরুত্বপূর্ণ। ছায়ানটের বর্ধিত অংশ বলা যেতে পারে পুবের হাওয়া কাব্যকে। সাম্যবাদী চিন্তাভাবনা প্রকাশ ঘটেছে মানবতাবাদী কবির *সাম্যবাদী* কাব্যগ্রন্থে। সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ *সর্বহারা* (১৯২৬) কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়। সর্বহারার বহু কবিতা *লাঙল* পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। ছোটোদের জন্যে লেখা *ঝিঙে ফুল* (১৯২৬) কাব্যে আছে লিচুচোর, খুকু ও কাঠবিড়ালী, খাঁদুদাদুর মতো বিখ্যাত কবিতাগুলি।

ফণিমনসা (১৯২৭)তে বিদ্রোহী কবিকে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। *সিন্ধুহিল্লোল* (১৯২৮) প্রেমকাব্য। 'গোপনপ্রিয়া', 'অনামিকার' মত কবিতাগুলি এতে আছে। ১৯২৮-এই প্রকাশিত হয় *জিঞ্জীর* কাব্যগ্রন্থ। ১৯২৯-এ প্রকাশিত *চক্রবাক* কাব্য প্রেম আর বিরহের যুগ্মকে বাঁধা, তার মধ্যে আছে কবির প্রকৃতিপ্রেমও। এই বছরেই প্রকাশিত সন্ধ্যা কাব্যে দ্রোহায়ন আর সমাজভাবনা প্রাধান্য পেয়েছে।

১৯৩০-এর আগস্টে বের হয় *প্রলয়শিখা* কাব্য যা পরের মাসেই রাজরোষে বাজেয়াপ্ত হয়। এরপর প্রকাশিত হয় *নির্ঝর* (১৯৩৯)। তাঁর অসুস্থতার পর বের হয় *নতুন চাঁদ* (১৯৪৫), মহানবীর জীবনী নিয়ে লেখা *মরু ভাস্কর* (১৯৫১), *শেষ সওগাত* (১৯৫৯) ও *ঝড়* (১৯৬১)। এছাড়াও *বুলবুল, চোখের চাতক, চন্দ্রবিন্দু* সহ অনেকগুলি গ্রন্থ সঙ্গীতগ্রন্থ হলেও সেখানে গানগুলির কথাতে কবি নজরুলকেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মত নজরুল-গীতিও বাঙালির চিরসম্পদ। তাঁর গানের প্রকৃত সংখ্যা কত তা আজকেও স্পষ্ট করে বলা যাবে না। অনেক লেখা আজও উদ্ধার করা যায়নি এ বাঙালির চরম অগৌরবের। এছাড়াও তিনি *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম* নামে ওমর খৈয়ামের আর *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* নামে হাফিজের কাব্যের অনুবাদ করেন। কোর-আন শরীফের আমপারা অংশের বাংলায় পদ্যানুবাদ করেন কাব্য *আম-পারা* (১৯৩৩) নামে। নজরুলের কবিতা সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, তিনি ছিলেন মিলনের কবি। তিনি সবরকম বৈষম্যের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তিনি বিদ্রোহী, তিনি সাম্যবাদী। ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, উঁচু-নিচু, শাসক-শোষিত— যেখানেই দেখেছেন বিভেদ, অত্যাচার সেখানেই গর্জে উঠেছেন তিনি। পরাধীন ভারতে স্বাধীনতাকামী কবির কলমকে ইংরেজরা ভয় পেত বলেই বারবার তাঁর বই নিষিদ্ধ করে, কারারুদ্ধ করে বা করতে চেয়ে তাঁকে দমিয়ে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু এই চিরবিদ্রোহীকে অবনত করা যায়নি। *আনন্দময়ীর আগমনে* থেকে উদ্ধৃত করা হল—

আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাড়াল।

দেব শিশুদের মারছে চাবুক বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসী,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,— আসবি কখন সর্বনাশী?

একক ১১.৩ কায়কোবাদ

১১.৩.১ জীবন : কবি কায়কোবাদের আসল নাম মোহম্মদ কাজেম আল কোরেশী। তিনি ১৮৫৭ সালে ঢাকার নবাবগঞ্জের আগলা-পূর্বপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা মাদ্রাসায় (বর্তমানে কবি নজরুল সরকারি কলেজ) এন্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েন, কিন্তু পরীক্ষার আগেই নিজের গ্রামেই পোষ্টমাস্টারের চাকুরি পেয়ে চলে যান। সমগ্র কর্মজীবনে এখানেই ছিলেন। ১৯৩২ সালে কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের মূল অধিবেশনের সভাপতি হন তিনি। ১৯২৫ সালে নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ থেকে কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ ও সাহিত্যরত্ন উপাধিতে সম্মানিত হন। ১৯৫১ সালের ২১ জুলাই ঢাকাতে কবির জীবনাবসান হয়।

১১.৩.২ সাহিত্যকীর্তি : উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে কবি হিসেবে কায়কোবাদ বিকাশিত হন। ১২৯৭ বঙ্গাব্দে ভারতী পত্রিকাতে তাঁর কবিতা বের হয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ বিরহবিলাপ বের হয় ১৮৭০ সালে। এরপর একে একে প্রকাশ পায় *কুসুমকানন* (১৮৯৩) এবং *অশ্রুমালা* (১৮৯৪)। গীতিকবিতার সংকলন হিসেবে অশ্রুমালা সবার কাছেই সমাদৃত হয়।

১৯০৪ সালে বের হয় তাঁর *মহাশ্মশান* মহাকাব্য। বাংলা সাহিত্যিক মহাকাব্যধারায় তিনিই ছিলেন শেষ উল্লেখযোগ্য কবি। এই কাব্যের জন্যেই তিনি সর্বাধিক খ্যাতি পান। তিন খণ্ডে বিভক্ত প্রায় নয়শো পাতার সুবিশাল মহাকাব্যটি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাজাতির পতন— এই বিষয় নিয়ে লেখা। প্রথম খণ্ডে ২৯ সর্গ, দ্বিতীয় খণ্ডে ২৪ সর্গ এবং শেষ সর্গে ৭ সর্গ নিয়ে মোট ৬০টি সর্গ আছে। এই কাব্যের বিস্তৃতি অনেক কিন্তু কাহিনিগুলি বিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকতাহীন হয়ে গেছে। দীর্ঘকথন, চরিত্ররচনায় ব্যর্থতা *মহাশ্মশান*-কেও ব্যর্থ মহাকাব্যের সারিতেই স্থান দিয়েছে। তবে একথাও তো স্মরণযোগ্য মধুসূদন ছাড়া কোনো বাঙালি কবিই তো মহাকাব্য রচনাতে সফল হননি।

তাঁর পরবর্তী কাব্যগুলি হল— *শিবমন্দির বা জীবন্ত সমাধি কাব্য* (১৯১৭), *অমিয়ধারা* (১৯২৩), *শ্মশানভস্ম* (১৯২৪), *মহরম শরিফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য* (১৯৩৩)। এছাড়াও কবির মৃত্যুর দীর্ঘদিন পর প্রকাশিত হয় *প্রেমের রাণী* (১৯৭০) ও *প্রেম পারিজাত* (১৯৭০)।

গীতিকাব্যতেই বিশেষ করে রোমান্টিক প্রেমকবিতাতে কবিদক্ষতা স্মরণযোগ্য—

তারে ভালোবেসে আমি কলঙ্কী ভুবনে
হায়রে সে মর্মব্যথা জানাইব কায়!

নিস্বার্থপ্রণয় মম, মুখে বচনে
কেমনে সে প্রেম আমি বুঝাইব হায়!

তাঁর রোমান্টিক কবিতার আরেকটি নমুনা—

কে তুমি
তুমি কি চম্পক-কলি?
গোলাপ মতিয়া
তুমি কি মল্লিকা যূথী ফুল্ল কুমুদিনী?
সৌন্দর্যের সুধাসিন্ধু,
শরতের পূর্ণ-ইন্দু,
আঁধার জীবন-মাঝে পূর্ণিমা রজনী।
কে তুমি রমণী-মণি?

তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী, রাধার বিরহবেদনা নিয়েও মর্মস্পর্শী কবিতা লিখেছেন। তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরাধীন ভারতে পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায়কে অতীত গরিমার কথা তাঁর কাব্যে মনে করিয়ে দিয়েছেন কবি।

একক ১১.৪ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

১১.৪.১ জীবন : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জন্ম ১৮৮৭ সালের ২৬ জুন বর্ধমানের পাতিলপাড়া গ্রামে। কবির পৈত্রিক নিবাস ছিল নদিয়ার শান্তিপুরের হরিপুর গ্রামে। পিতা দ্বারকানাথ। শিবপুর কলেজ থেকে বি.ই. ডিগ্রি লাভ করে কর্মজীবন শুরু করেন। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এই কবি তাই নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি পেয়েছিলেন।

১৯৫৪ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

১১.৪.২ সাহিত্যকীর্তি : তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি হল— *মরীচিকা* (১৯২৩), *মরুশিখা* (১৯২৭), *মরুমায়া* (১৯৩০), *সায়ম* (১৯৪০), *ত্রিযামা* (১৯৪৮), মৃত্যুর পর প্রকাশিত— *নিশান্তিকা* (১৯৫৭)।

১৩১৭ থেকে ১৩২৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে লেখা হয় প্রথম কাব্যগ্রন্থ *মরীচিকার* কবিতাগুলি। প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে। তাঁকে বলা হত দুঃখবাদী কবি। রবীন্দ্রনাথ থেকে বেরিয়ে এসে নতুন ধারায় কাব্যরচনার প্রচেষ্টা ছিল তাঁর। তাই রোমান্টিক রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের কবিতায় সুখ-আনন্দ-সৌন্দর্যের বিপরীতে দুঃখবাদকেই বেছে নিলেন। তাঁর কবিতায় তাই রোমান্টিক কবিদের কবিতার যে বিষয় সেগুলির বিরুদ্ধ স্বর শোনা গেল। যেমন, প্রেম সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব, প্রকৃতিকে সদর্থকভাবে না দেখে নঞর্থকভাবে

দেখা, ঈশ্বর বা ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সংশয়। তাঁর কবিতার একটি প্রধান দিক হল মানবতাবাদ, বঞ্চিত-শোষিত-নিরন্ন মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি। তাঁর কবিতার নিদর্শন—

বজ্রে যে জনা মরে,
নবঘনশ্যাম শোভার তারিফ সে বংশে কে বা করে?
ঝড়ে যার কুঁড়ে উড়ে,—
মলয়-ভক্ত হয় যদি, বল কি বলিব সেই মূঢ়ে!

মরীচিকা (১৯২৩), *মরুশিখা* (১৯২৭), *মরুমায়া* (১৯৩০) কাব্য তিনটির পর *সায়ম* (১৯৪০) থেকে কবির কাব্যে অন্য বাঁক দেখা যায়। এই কাব্য থেকে দেখা যায় উপরের বৈশিষ্ট্যগুলি থাকলেও বিরোধিতার মধ্যেও সৌন্দর্য বা প্রেমের আভাস।

যে-দাবদাহনে বাহন করিয়া এ জীবন পোড়ালেম—
আজ মনে হয়, এ দগ্ধ ভালে সেই ছিল মোর প্রেম। (সমাধান)

বাংলায় আধুনিকতার প্রচেষ্টায় প্রথম যে তিনজন কবি সচেষ্ট ছিলেন তাঁদের একজন যতীন্দ্রনাথ। আধুনিক কবিদের পূর্বসূরী হিসেবেই মোহিতলাল আর নজরুলের সঙ্গে একাসনে উচ্চারিত হবে তাঁর নাম।

একক ১২.১ জীবনানন্দ দাশ

১২.১.১ জীবন : কবি জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশ) বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন স্কুল শিক্ষক। তিনি *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তাঁর মা বিখ্যাত কবি কুসুমকুমারী দাশ। বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। ব্রজমোহন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ পাস করে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হন। সেখান থেকে ইংরেজি নিয়ে বি.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতেই এম.এ. পাস করেন। আইনে ভর্তি হলেও পড়া শেষ করেননি। সিটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯২৮ সালে সেখান থেকে বরখাস্ত হন। ১৯২৯-এ যোগ দেন বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে। পরে দিল্লির রামযশ কলেজে যোগ দেন। ১৯৩০-এ লাবণ্য গুপ্তকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। ১৯৩৫-এ যোগ দেন জন্মস্থান বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে। ১৯৪২-এ পিতৃবিয়োগ হয়। ১৯৪৭-এর জানুয়ারিতে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত দৈনিক *স্বরাজ* পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে যুক্ত হন। ব্রজমোহন কলেজে ইস্তফা দেন। ১৯৪৭-এর শেষে স্বরাজ পত্রিকা থেকে সরে আসেন। ১৯৪৮-এ মাতৃবিয়োগ। ১৯৫০-এ সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হন, পরের বছর এর মুখপত্র *দ্বন্দ্ব* পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক হন। এই বছরই খড়্গপুরের কলেজে যোগ দেন। পরের বছরের শুরুতেই সে চাকুরি থেকে বরখাস্ত হন। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক পুরস্কৃত হন। ১৯৫৩-তে হাওড়া গার্লস কলেজে নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর ট্রাম দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হন এবং ২২ অক্টোবর তাঁর জীবনাবসান হয়।

১২.১.২ সাহিত্যকীর্তি : কবি হিসেবেই তাঁর প্রথম পরিচয়। যদিও তিনি কবিতার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি উপন্যাস, একশোর মত গল্প এবং অন্যান্য রচনাও লিখেছেন।

তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি হল— *ঝরা পালক* (১৯২৭), *ধূসর পাণ্ডুলিপি* (১৯৩৬), *বনলতা সেন* (১৯৪২), *মহাপৃথিবী* (১৯৪৪), *সাতটি তারার তিমির* (১৯৪৮), *রূপসী বাংলা* (১৯৫৭), *বেলা অবেলা কালবেলা* (১৯৬১)।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরা পালকের* কবিতাগুলি *প্রবাসী, বঙ্গবাণী, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, বিজলী* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। *ঝরা পালক* কাব্যগ্রন্থে পূর্বসূরী কবি যেমন নজরুল, মোহিতলাল, সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। এর নয় বছর পর প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকেই জীবনানন্দের কবিসত্তা তাঁর নিজস্ব গতিতে আবির্ভূত হল। এই বইয়ের কবিতাগুলি ১৩৩২ থেকে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রকাশিত। *বনলতা সেন* বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ভবন থেকে এক পয়সায় একটি গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়

১৯৪২-এ। পরে ১৯৫২তে সিগনেট প্রেস থেকে বের হয়। *মহাপৃথিবীর* কবিতাগুলি ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে লেখা। বনলতা সেন নামক কবিতাটিসহ ওই নামের কাব্যের কয়েকটি কবিতা গ্রন্থে স্থান পায়।

১৩৩৫ থেকে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছিল *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থের কবিতাগুলিও। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত *রূপসী বাংলা* কাব্যগ্রন্থ। বাংলার আবহমানকালের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন কবিতাগুলিকে। গভীর ভালোবাসায় রূপসী বাংলার কবি বলে ওঠেন—

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর (বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি)

ধূসর পাণ্ডুলিপি পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল এই কবিতাগুলি। *বেলা অবেলা কালবেলা* কাব্যটিও মৃত্যুর পর প্রকাশিত হলেও এই গ্রন্থের নামকরণ ও কবিতা-নির্বাচন কবিই করে গিয়েছিলেন।

আধুনিক কবি হিসেবে তাঁর কাব্যে পাওয়া যায় পরাবাস্তবতার ছবি। বিষণ্ণতাবোধ, মৃত্যুচেতনা, নির্জনতা, বিরহচেতনা, ইতিহাসবোধ— তাঁর কবিতার অন্যতম অবলম্বন। তাঁর কবিতায় চিত্র-রূপ-বর্ণের ব্যবহার তাঁকে অন্যদের থেকে পৃথক করেছে। প্রেম আর প্রকৃতিও তাঁর কাব্যের আশ্রয়। 'পাখির নীড়ের মত চোখ', 'উটের গ্রীবার মত নিস্তব্ধতা', 'আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো অন্ধকার', 'কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলো'— এইসব উপমার প্রয়োগ এবং চিত্রকল্পের অভিনব ব্যবহার তাঁকে স্বতন্ত্র করেছে।

জীবনানন্দের কবিতার কয়েক পঙ্‌ক্তি—

পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা
সত্য, তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়। (সুচেতনা)

একক ১২.২ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

১২.২.১ জীবন : কলকাতার হাতিবাগানের এক অভিজাত পরিবারে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর জন্ম। পিতা বিখ্যাত পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মাতা পটলডাঙ্গার খ্যাতনামা বসুমল্লিক পরিবারের কন্যা ইন্দুমতী দেবী। ১৯১৮ সালে কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২২ সালে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে স্নাতক হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আইন পড়তেও শুরু করেন। যদিও শুধু ডিগ্রির কথা ভাবেননি বলেই কোন বিষয়েই আর পরীক্ষা দেননি। তাঁর কর্মজীবন সংক্ষিপ্ত হলেও বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন কাজ করেছেন। *ফরওয়ার্ড, সবুজপত্র, হিউম্যানিস্ট*

ওয়ে, স্টেটসম্যান সহ নানা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেও এ বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল— পরিচয় পত্রিকার সম্পাদনা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনাও করেন ১৯৫৬-১৯৬০, এই সময়কালে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছুদিন অতিথি অধ্যাপক ছিলেন। বিদেশি ভাষাশিক্ষায় তাঁর অনুরাগ ছিল। ১৯৬০ সালের ২৫ জুন তাঁর জীবনাবসান হয়।

১২.২.২ সাহিত্যকীর্তি : তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি হল— *তন্বী* (১৯৩০), *অর্কেস্ট্রা* (১৯৩৫), *ক্রন্দসী* (১৯৩৭), *উত্তরফাল্গুনী* (১৯৪০), *সংবর্ত* (১৯৫৩), *প্রতিধ্বনি* (১৯৫৪), *দশমী* (১৯৬০)। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা কুক্কুট, প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। শোনা যায় বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথোপকথনের সূত্র ধরেই এই কবিতার জন্ম। প্রথম কাব্যগ্রন্থ তন্বীতে রবীন্দ্র-প্রভাব থাকলেও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *অর্কেস্ট্রা* থেকেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য চেনা যায়। দেহজ প্রেম আর সেই ক্ষণ, ছিন্ন প্রেমের জন্য প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে গ্রথিত হয়েছে কবিতাগুলি। এই কাব্যগ্রন্থের একটি বিখ্যাত কবিতা 'শাশ্বতী'। এই কবিতা থেকে উদ্ধৃত করা যাক—

একটি কথার দ্বিধাথরথর চুড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি।

ক্রন্দসী-তে অবশ্য নিষ্ঠুর বিশ্বের, যুগযন্ত্রণার ছবি যেমন আছে তেমনই নৈরাশ্য, নিষ্ফলতার পাশাপাশি প্রতিবাদ বা বিশ্বাসের প্রচ্ছন্ন সুরটিও একেবারে অনুপস্থিত নয়। *উত্তরফাল্গুনী* প্রেমকে উপজীব্য করেই লেখা কাব্যগ্রন্থ। তবে সেই প্রেম তাঁর নিজস্ব কাব্যভাবনার পথ থেকেই জাত। ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত লেখা কবিতা নিয়ে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ সংবর্ত-তে আছে দ্বিতীয় মহাসমরে বিপন্ন বিশ্বের অভিঘাত। অনুবাদ কবিতাতেও তাঁর দক্ষতার পরিচয় বহন করে *প্রতিধ্বনি* কাব্যগ্রন্থ। দশটি কবিতার সংকলন দশমীতে আবার স্মৃতিমেদুরতার মেজাজ পাই। ক্ষণবাদ, নৈরাশ্যবাদ, নাস্তিবাদ, অদৃষ্টবাদ, নাগরিক জীবনের যন্ত্রণা প্রভৃতি বিষয়গুলি তাঁর কবিতায় কাজ করে গেছে। তাঁর কবিতায় মিথের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। পুরাণকে প্রয়োজনে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখেছেন। শব্দ-ব্যবহারে তিনি আভিধানিক, অপ্রচলিত, তৎসম শব্দের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি মালার্মের সঙ্গে সমালোচকরা তাঁর মিল খুঁজে পান। তাই তাঁর কবিতার ভাষা ধ্রুপদী হয়ে উঠেছে।

একক ১২.৩ অমিয় চক্রবর্তী

১২.৩.১ জীবন : ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল হুগলির শ্রীরামপুরে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম হয়। পৈত্রিক নিবাস অবিভক্ত বাংলার পাবনার ভারেঙ্গায়। পিতা দ্বিজেশচন্দ্র, মাতা অনিন্দিতা দেবী। ১৯১৭তে হেয়ার স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে আই.এ. ও পরে

১৯২১এ ইংরেজিতে সাহিত্য, দর্শন ও উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতক হন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি পান। অক্সফোর্ড থেকে টমাস হার্ডিকে নিয়ে গবেষণা করে পান ডক্টরেট ডিগ্রি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, পাতিয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ওয়াশিংটনের হাওয়ার্ড, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়, বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়, মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়— দেশেবিদেশের বহু নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে দীর্ঘদিন তিনি কবিসঙ্গ পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। ইউনেস্কো পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, পদ্মভূষণসহ একাধিক পুরস্কারে তিনি ভূষিত হন। ১৯৮৬এর ১২ জুন শান্তিনিকেতনে তাঁর জীবনাবসান হয়।

১২.৩.২ সাহিত্যকীর্তি : ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম কবিতা সমবয়সী। সেটি ছিল সনেট। তার একুশ বছর পর বের হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *খসড়া* (১৯৩৮)। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়— 'এ একেবারেই আধুনিক, একেবারেই অভিনব। পরের কাব্য *একমুঠো* (১৯৩৯), রবীন্দ্রনাথ বলেন— নবযুগের কাব্য। ফ্রয়েডিয় ভাবনা আর বিজ্ঞানচেতনা তাঁর কাব্যকে অন্যমাত্রায় নিয়ে গেছে। একমুঠোর *চেতন স্যাকরা* তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। তিনি বিশ্ব-পরিব্রাজক, কিন্তু বাংলাদেশ তাঁর মনের গভীরে ছিল। *মাটির দেওয়াল* (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থে তাঁর নমুনা দেখতে পাই। *অভিজ্ঞান বসন্ত* (১৯৪৩) কাব্যগ্রন্থের সাতটি পর্যায়— *প্রাথমিক, প্রদক্ষিণ, সূর্য-খণ্ডিত ছায়া, মন-মাধ্যাহ্নিক, সংসার* এবং *দিনযাপন*। এই কাব্যগ্রন্থের 'সংগতি' কবিতাটি তাঁর অধ্যাত্মচেতনার প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা হতে পারে—

তোমার আমার নানা সংগ্রাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন।

দূরযানী (১৯৪৪) কাব্যগ্রন্থে ছান্দসিক কবির দক্ষতার নিদর্শন। পারাবার (১৯৫৩) কাব্যগ্রন্থের কবিতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু-সমস্যা নিয়ে সমকালও বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাব্য *পালাবদল*, ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে জন্ম-শতবর্ষে কবির শ্রদ্ধাঞ্জলি *ঘরে ফেরার দিন* (১৯৬১)। *হারানো অর্কিড* (১৯৬৬), *পুষ্পিত ইমেজ* (১৯৬৭), *অমরাবতী* (১৯৭২), *নতুন কবিতা* (১৯৮০) তাঁর শেষদিকের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

একক ১২.৪ বুদ্ধদেব বসু

১২.৪.১ জীবন : ১৯০৮ সালের ৩০ নভেম্বর কুমিল্লায় তাঁর জন্ম। পিতা ভূদেবচন্দ্র, মাতা বিনয়কুমারী। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মাকে হারালে মাতামহী স্বর্ণলতা তাঁকে মাতৃস্নেহে লালনপালন করেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পরীক্ষায় তিনি

প্রথম হন। ছাত্রাবস্থা থেকেই লেখালেখি ও সম্পাদনার শুরু। কবিতা ছাড়াও গল্প-উপন্যাস, সাহিত্য সমালোচনা সহ সাহিত্যের নানা শাখাতেই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ অধিকার। সাড়া জাগানো পত্রিকা *কল্লোল-কালিকলমের* সঙ্গে তাঁর ছিল নাড়ির যোগ। ১৯২৭এ বন্ধু অজিত দত্তের সঙ্গে সম্পাদনা করেন *প্রগতি* পত্রিকা। ১৯৩৫ সালে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন *কবিতা* পত্রিকা। পঁচিশ বছরের বেশি সময় ধরে যা বাংলা কাব্য-আন্দোলনের বার্তাবহ ছিল। রিপন কলেজ, পিটার্সবার্গের পেনসিলভানিয়া কলেজ ফর উইমেন এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে নানাসময় অধ্যাপনা করেছেন। দেশবিদেশের বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা ও অধ্যাপনা তিনি করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ তাঁর হাতেই গড়া। স্টেটসম্যান পত্রিকায় সাংবাদিকতা, ইউনেস্কোর বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পের কাজও তিনি করেছেন। সাহিত্য আকাদেমি, পদ্মভূষণ, মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার সহ একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৮ মার্চ, ১৯৭৪তে তাঁর দেহাবসান হয়।

১২.৪.২ সাহিত্যকীর্তি : ছাত্রাবস্থাতেই *মর্মবাণী* (১৯২৪) কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। *বন্দীর বন্দনা* (১৯৩০) থেকেই তিনি তাঁর প্রতিভা চেনালেন। নাম কবিতাতে তাঁর সদর্প উচ্চারণ—

> আমি যে রচিবো কাব্য, এ উদ্দেশ্য ছিল না স্রষ্টার;
> তবু রচিলাম কাব্য; এই গর্ব বিদ্রোহ আমার (বন্দীর বন্দনা)

এরপর প্রকাশিত হল *একটি কথা* (১৯৩২), *পৃথিবীর পথে* (১৯৩৩)। *কঙ্কাবতী* (১৯৩৭) কাব্যগ্রন্থে মহিমান্বিত প্রেমের ছবি এঁকেছেন। *নতুন পাতা* (১৯৪০) গদ্যকবিতা সংকলন। *দময়ন্তী* (১৯৪৩) কাব্যগ্রন্থ থেকে তাঁর কাব্যধারায় নতুন আরেক বাঁক পাই। এখানে বাকছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলন ঘটালেন। (জগদীশ ভট্টাচার্য, আমার কালের কয়েকজন কবি, ভারবি, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ১৬১)।

এরপর একে একে প্রকাশিত হল— *রূপান্তর* (১৯৪৪), *দ্রৌপদীর শাড়ি* (১৯৪৮), *শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর* (১৯৫৫), *যে আঁধার আলোর অধিক* (১৯৫৮), *মরচে পড়া পেরেকের গান* (১৯৬৬), *স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৭১), *সংক্রান্তি: প্রায়শ্চিত্ত: ইক্ষাকু সেন্নিন* (১৯৭৩)।

তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতাকে অন্যভাবে ব্যবহার করেছেন। প্রেমের কবি ছিলেন বুদ্ধদেব। সেই প্রেম দেহকে অস্বীকার করে নয়। নাগরিকতাও তাঁর কাব্যের অন্যতম বিষয়। সেই নগরসভ্যতাকে দেখার ক্ষেত্রেও রোমান্টিকতা অনুপস্থিত নয়। পুরাণ চেতনার অভিনব ব্যবহার দময়ন্তী বা *দ্রৌপদীর* শাড়ির মতো কবিতায় চোখে পড়ে। অনেক সমালোচক তাঁর মধ্যে ফরাসী কবি বোদলেয়ারের সাদৃশ্য খুঁজে পান। তিনি আঙ্গিক সচেতন কবি। তাই তাঁর সমগ্র কাব্যধারায় আঙ্গিক নিয়ে বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চোখে পড়ে।

একক ১২.৫ বিষ্ণু দে

১২.৫.১ জীবন : ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই উত্তর কলকাতার পটলডাঙ্গায় বিষ্ণু দে জন্মগ্রহণ

করেন। পিতা অবিনাশচন্দ্র। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, বঙ্গবাসী কলেজ এবং সেন্ট পলস কলেজের শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ পাশ করেন। রিপন কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং মৌলানা আজাদ কলেজ, কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন। পরিচয়, সাহিত্যপত্র, নিরুক্ত— এইসব পত্রকার সম্পাদনার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি সাহিত্য আকাদেমি, জ্ঞানপীঠ, নেহরু স্মৃতি পুরস্কার, সোভিয়েত ল্যান্ড পুরস্কার সহ একাধিক পুরস্কার পান। চিত্রশিল্প বিষয়েও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর জীবনাবসান হয় ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর।

১২.৫.২ সাহিত্যকীর্তি : *প্রগতি, কল্লোল* সহ নানা পত্রিকায় তাঁর কবিতা সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়। তিনি ছিলেন আধুনিক কবিপঞ্চকের অন্যতম। তাঁর কাব্যে টি এস এলিয়টের প্রভাব ছিল আস্থা ছিল মার্ক্সবাদেও। *উর্বশী ও আটামিস* (১৯৩৩) কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তাঁর কবিত্বশক্তির প্রশংসা করেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদেশি পৌরাণিক, ভৌগোলিক উপমার বহুল ব্যবহারকে মুদ্রাদোষ, দুর্বলতা বলেছিলেন। আসলে এটিও বিষ্ণু দে-র অভিনব প্রকরণভাবনার ফসল।

প্রথম কাব্যগ্রন্থের মত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *চোরাবালি* (১৯৩৭)-তেও প্রেম বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এই কাব্যগ্রন্থের অন্যতম বিখ্যাত কবিতা চোরাবালি—

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার।

পূর্বলেখ (১৯৪১) থেকে তাঁর মার্ক্সীয় ভাবনার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাত ভাই চম্পা (১৯৪৫) কাব্যেও সাম্যবাদে বিশ্বাসী কবিভাবনার প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠস্বর উঠে আসে। এরপর প্রকাশিত হয় *সন্দীপের চর* (১৯৪৭)। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনে বিশ্বাসী লালমোহনকে দাঙ্গাবাজদের হাতে সন্দীপের প্রাণ দিতে হয়। তাঁকে স্মরণ করেই নামকবিতাটি লেখা। এরপর একে একে প্রকাশিত হয়, তাঁর অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ—

অনিষ্ট (১৯৫০), *নাম রেখেছি কোমল গান্ধার* (১৯৫৩), *আলেখ্য* (১৯৫৮), *তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ* (১৯৫৮), *স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ* (১৯৬৩), *সেই অন্ধকার চাই* (১৯৬৬), *সংবাদ মূলত কাব্য* (১৯৬৯), *ইতিহাসে ট্র্যাজিক উল্লাসে* (১৯৭০) *রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে* (১৯৭৩), *ঈশাবাসা দিবানিশা* (১৯৭৪), *চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর* (১৯৭৫), *উত্তরে তাকে মৌন* (১৯৭৭), *আমার হৃদয়ে বাঁচো* (১৯৮১)।

কোন কোন সমালোচক তাঁর কবিতায় দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তুললেও বিষ্ণু দে চেয়েছিলেন পাঠক প্রস্তুত হয়ে তাঁর কবিতার রসাস্বাদন করবেন।

একক ১২.৬ সমর সেন

১২.৬.১ জীবন : ১৯১৬এর ১০ অক্টোবর কলকাতার বাগবাজারে সমর সেনের জন্ম। আদিতে তাঁরা ছিলেন ঢাকার সুয়াপুরের বাসিন্দা। পিতা অধ্যাপক অরুণচন্দ্র, মাতা চন্দ্রমুখী। পিতামহ ছিলেন স্বনামধন্য দীনেশচন্দ্র সেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কাশিমবাজার স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৩৬এ স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্নাতক হন। ১৯৩৮এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে প্রথম থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্নাতক হন। ১৯৩৮এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েই স্নাতকোত্তর হন। কাঁথির প্রভাতমোহন কলেজ, দিল্লীর রামযশ কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করেছেন। অনুবাদক হিসেবে মস্কো গেছেন। অল ইন্ডিয়া রেডিওর সংবাদ বিভাগ, *স্টেটসম্যান পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড নাউ* পত্রিকার সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন। নিজে প্রকাশ করেছেন *ফ্রন্টিয়ার* পত্রিকা। কবিতা পত্রিকার সহকারী সম্পাদকও ছিলেন একসময়। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট তাঁর দেহাবসান ঘটে।

১২.৬.২ সাহিত্যকীর্তি : মাত্র বারো বছর তাঁর কবিতা রচনার সময়কাল, ১৯৩৪-১৯৪৬। কবির আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কাব্যরচনা করেছেন। *কয়েকটি কবিতা* (১৯৩৭) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। নিজের প্রাপ্ত স্বর্ণপদক বেচে বই বের করেন। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের কবি বলা হয় তাঁকে। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *গ্রহণ* (১৯৪০)-এ অবশ্য আশাবাদ একেবারে অনুপস্থিত নয়। *নানাকথা* (১৯৪২) গ্রন্থে দীর্ঘকবিতা দেখা যায়। *খোলা চিঠি* (১৯৪৩) কবিতাভবনের এক পয়সার একটি সিরিজের গ্রন্থ। সাতটি কবিতার সংকলন। সমকালের বিশ্ব ইতিহাসের বিপর্যয়ের ছবি এই কবিতাগুলিতে ধরা পড়েছে। শেষ কাব্যগ্রন্থ *তিন পুরুষ* (১৯৪৪)। নাগরিক কবি পরিচ্ছন্ন গ্রামের আশ্বাস দিয়ে শুরু করলেন কাব্যগ্রন্থ। গদ্যছন্দে দক্ষ কবি পরিচ্ছন্ন গ্রামের আশ্বাস দিয়ে শুরু করলেন কাব্যগ্রন্থ। গদ্যছন্দে দক্ষ কবি এই গ্রন্থে কয়েকটি ক্ষেত্রে পদ্যছন্দও ব্যবহার করেছেন।

একক ১২.৭ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১২.৭.১ জীবন : ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯ সালে কৃষ্ণনগরে মাতুলালয়ে জন্ম। পৈত্রিক নিবাস ছিল শান্তিপুর। পিতা ক্ষিতীশচন্দ্র, মাতা যামিনীবালা। ১৯২৯-এ কঠিন রোগে আক্রান্ত হন, স্বাভাবিক হতে প্রায় দুই বছর সময় লাগে। ফলে পড়াশোনায় প্রভাব পড়ে। ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করেন। তার আগে রাজশাহীর নওগাঁর স্কুল, কলকাতার মেট্রোপলিটন, সত্যভামা ইনস্টিটিউশনে পড়েছেন। আশুতোষ কলেজে এরপর ভর্তি হন। স্কটিশ থেকে দর্শনে স্নাতক হলেও এম.এ. পরীক্ষা দিতে পারেননি।

স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে কাব্যরচনা শুরু হয়। তারপর সদ্য স্বাধীন দেশে অনেক অতৃপ্তি আর অপূর্ণতা

চোখে দেখে কম্যুনিজমের আদর্শে প্রাণিত কবির চোখে সাম্যবাদের স্বপ্ন ভিড় করে। প্রসঙ্গত স্বাধীনতার আগেই কিশোর-বয়সেই সক্রিয় কবি ১৯৩২-৩৩-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিশোর ছাত্রদলের সদস্য হন। ১৯৪২ সালেই কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন কবি, ১৯৪৩ এই পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী (হোলটাইমার) হন। ১৯৪৮ পার্টি নিষিদ্ধ হয়, এ বছরই প্রকাশিত হয় *অগ্নিকোণ*।

মার্কসীয় সাম্যবাদের আদর্শে নিজেকে এতটাই জড়িয়ে ফেলেছিলেন কবি যে পার্টির কাজে ব্যস্ত থেকে এম.এ. পরীক্ষাটাও দিতে পারলেন না। কবিতাতেও তাই সেই ভাবনা উঁকি দেয় যা অনাগত দিনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল। মাথায় রাখতে হবে ১৯৪৩-এ যে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ গড়ে ওঠে কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তাঁর যুগ্মসম্পাদক হন তিনি। ১৯৪৮ সালে পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হলে তার জন্যে ১৯৪৯-এ কবিকেও কারাবরণ করতে হয়, ১৯৫০-এর নভেম্বরে ছাড়া পান। ১৯৫১-তে *পরিচয়*-এর সম্পাদক হন। গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এইসময়েই বিবাহ। লেখালেখি, সম্পাদনার সঙ্গে পার্টির কাজ ছিল সর্বক্ষণের। ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৪-তে পার্টির ভাঙ্গন, সুভাষ অবশ্য পুরোনো পার্টিতেই থেকে গেলেন। যুক্তফ্রন্ট ভাঙার প্রতিবাদে ১৪৪ ধারা ভেঙে ১৯৬৭-তে তেরো দিনের কারাবাস। ১৯৮১-এ পার্টির সদস্যপদ ছাড়েন। সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৬৪), আনন্দ পুরস্কার (১৯৮৪), জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (১৯৯২), সাহিত্য আকাদেমি ফেলোশিপ (১৯৯৬), বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম সহ দেশেবিদেশের প্রচুর পুরস্কার পেয়েছেন কবি। কবিতা ছাড়াও উপন্যাস, গদ্যেও তাঁর দক্ষতা কম ছিল না। কিছুদিন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে বিখ্যাত *সন্দেশ* পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুলাই কলকাতায় তাঁর জীবনাবসান হয়।

১২.৭.২ সাহিত্যকীর্তি : উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল— *পদাতিক* (১৯৪০), *অগ্নিকোণ* (১৯৪৮), *চিরকুট* (১৯৫০), *ফুল ফুটুক* (১৯৫৭), *যত দূরেই যাই* (১৯৬২), *কাল মধুমাস* (১৯৬৬), *এই ভাই* (১৯৭১), *ছেলে গেছে বনে* (১৯৭২), *একটু পা চালিয়ে, ভাই* (১৯৭৯), *জল সইতে* (১৯৮১), *চইচই চইচই* (১৯৮৩), *বাঘ ডেকেছিল* (১৯৮৫), *যারে কাগজের নৌকো* (১৯৮৯), *ধর্মের কল* (১৯৯১), *একবার বিদায় দে, মা* (১৯৯৫), *ছড়ানো ঘুঁটি* (২০০১)।

মার্কসবাদী কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পদাতিক* থেকেই সমকালকে বিষয় করা হচ্ছে। রোমান্টিকতার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে কবি তাই বলেন—

প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া (‘মে দিনের কবিতা’)

চিরকুটেও কবি তাঁর লড়াকু মনোভাবকে কাব্যে এনেছেন—

ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লাল ঝাণ্ডা ওড়াই ('দীক্ষিতের গান')

স্ট্রাইক, মিছিল, বিপ্লব— এইসব শব্দবন্ধ কবির কাব্যে তাই অনায়াসে সে গেছে। *অগ্নিকোণ* আকারে ছোটো কিন্তু সেখানেও বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর কবি। দশ বছর পরে ১৯৫৮তে বের হয় চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ *ফুল ফুটুক*। সমকালের পাশাপাশি আশাবাদও এখানে অনুপস্থিত নয়। এরপর বেশ কয়েক দশক ধরে লিখেছেন বহু কাব্য। বদল হয়েছে তাঁর ভাবনার, বদল হয়েছে সময়ের। কিন্তু তাঁর কবিতায় থেকে গেছে সমাজের, জীবন ও জগতের টুকরো টুকরো ছবি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অনুপুঙ্খ। সুবিধাবাদীদের ব্যঙ্গ আর সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি। সংগ্রামের মধ্যেই থাকে আশাবাদ, জীবন-প্রেম!

আমি যত দূরেই যাই।
আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকোনো উঠোনে
সারি-সারি
লক্ষ্মীর পা
আমি যত দূরেই যাই। ('যত দূরেই যাই')

একক ১২.৮ কবিতা সিংহ

১২.৮.১ জীবন : কবিতা সিংহের জন্ম ১৯৩১ সালের ১৬ অক্টোবর, কলকাতার ভবানীপুরে। পিতা শৈলেন্দ্র, মা অন্নপূর্ণা। ছবি আর নাচে উৎসাহ ছিল। বেলতলা গার্লসে স্কুলশিক্ষা, তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এস.সি. পাঠরত অবস্থায় বিয়ে। ২০ বছর বয়সে বিবাহ করেন রঙপুরের জমিদারবাড়ির ছেলে সহপাঠী বিমল রায়চৌধুরীকে। পরে যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতক হন। কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন। সাংবাদিকতা তাঁর পেশা ছিল। আকাশবাণীতে কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন কলকাতা কেন্দ্রের প্রথম মহিলা অধিকর্তা।

স্বামীর সঙ্গে ১৯৬৬তে বার করতেন দৈনিক কবিতা পত্রিকা। *ইদানীং* পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত ছিল তাঁর নাম ১৯৭৯তে বেতারে কর্মের সূত্রে পূর্ব জার্মানিতে ভ্রমণ। ১৯৮১তে আইওয়াতে আন্তর্জাতিক লেখক কর্মশালাতে চার মাসের জন্য আমন্ত্রিত ছিলেন। ১৯৮৬তে ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় ভারতীয় লেখক হিসেবে যোগদান করেন। কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা লেখকদের উপর গবেষণা সূত্রেও বহুবার বিদেশযাত্রা করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা পুরস্কার, অমৃতবাজার পত্রিকার মতিলাল পুরস্কার, নাথমল ভুয়ালকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। সুলতানা চৌধুরী ছদ্মনামেও লিখতেন। ১৯৯৮ সালের ১৭ অক্টোবর আমেরিকার বোষ্টন শহরে তাঁর জীবনাবসান হয়।

১২.৮.২ সাহিত্যকীর্তি : মাত্র পনেরো বছর বয়সেই *নেশন* পত্রিকাতে তাঁর কবিতা প্রকাশ হয়। কবিতার পাশাপাশি গল্প-উপন্যাসেও কৃতিত্ব দেখান তিনি। *দেশ, শতভিষা, কৃত্তিবাস* সহ নানা পত্র-পত্রিকায় অর্ধশতাব্দী ধরে প্রচুর কবিতা লিখেছেন তিনি, যদিও জীবদ্দশায় কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে মাত্র তিনটি। 'মহিলা কবি' এই সংকীর্ণ-স্বীকৃতি ছেড়ে পাঁচের দশকের এই কবি কবি হিসেবেই মর্যাদা চেয়েছেন।

১৯৬৫তে প্রকাশিত হয় প্রথম কবিতাগ্রন্থ *সহজসুন্দরী*। তাঁর মতে গ্রন্থটি আঠারো বছর ধরে লেখা অসংখ্য কবিতা থেকে বেছে নেওয়া কিছু কবিতার সংকলন। ১৯৭৬তে কবিতার দ্বিতীয় বই কবিতা *পরমেশ্বরী* বের হয়। ১৯৮৩তে প্রকাশিত হয় *হরিণা বৈরী* কাব্যগ্রন্থ। কবি হিসেবে তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন নারীদের বঞ্চনা, ক্ষোভ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুতুল করে রাখার প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বর। তাঁর কাব্যে তাই ঈশ্বর নয় ঈশ্বরীর দেখা মেলে। ঈশ্বরকে অভিযুক্ত করতে পারে প্রথম নারী ইভ। তাঁর কবিতায় এসে গেছে নারীর একাকীত্ব, চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনার ছবিও। নারী-পুরুষের ভেদাভেদ চান না বলেই কবিকথক বলে ওঠেন—

অন্তত একজন থাক রমণী পুরুষ ভেদ যে করে না লিঙ্গ নির্ণয়ে
অন্তত একজন থাক যে ভোলেনি মায়ের লাঞ্ছনা
অন্তত একজন থাক আপোসবিহীন একা নিয়তি-নির্দেশে।
আমার ঘৃণার জন্য কোনো ক্ষমা প্রার্থনা করি না।
('কোনো ক্ষমা প্রার্থনা করি না')

সমাজ-চেতনা কবির কবিতায় এসেছে কন্যাভ্রূণ হত্যা প্রসঙ্গ, দলিত-নির্যাতনের কথা। গদ্যছন্দে যেমন ছিল সহজাত অধিকার, তেমনি পদ্যছন্দেও তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত—

কিছু যেন আর ভালো লাগে না এ-রৌদ্র ছাড়া
টিফিন ফুরোল ফিরে যাও খোপে, অফিস পাড়া
সূর্য আমার মেয়াদ ছাপালে, ভোলালে বেলা
সময় গিয়েছে, নেই সে খেয়াল সিগুারেলা।
('সূর্য তোমার ঘড়ি কত বলে?')

অনুশীলনী:

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী:

১। 'বাংলা কাব্যধারায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আধুনিকতার সূত্রপাত করেন'—মন্তব্যটি যথার্থ কি না আলোচনা করুন।

২। আখ্যান কাব্যের ধারায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৩। বাংলা মহাকাব্যের ধারায় মধুসূদন, নবীনচন্দ্র ও কায়কোবাদের অবদান আলোচনা করুন।

৪। কবি হিসেবে মধুসূদনের বাংলাসাহিত্যে কী অবদান আছে তা আলোচনা করুন।

৫। 'বাংলাসাহিত্যে বিহারীলাল গীতিকবিতার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ'—উক্তিটি যথার্থ কিনা বুঝিয়ে দিন।

৬। কবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখুন।

৭। 'রবীন্দ্রনাথ থেকে বেরিয়ে এসে নতুন পথের সন্ধান করেছিলেন নজরুল ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত'—মন্তব্যটি যথার্থ কি না যুক্তিসহ বুঝিয়ে দিন।

৮। বাংলা কাব্যধারায় কবিপঞ্চকের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৯। 'বাংলা কাব্যে আধুনিকতার অন্যতম দিশারী জীবনানন্দ'—যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

১০। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ধারায় সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও কবিতা সিংহের অবদান আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। রঙ্গলালের লেখা দুটি আখ্যানকাব্যের নাম লিখুন।

২। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যের দুটি পত্রের নাম লিখুন।

৩। ত্রয়ী মহাকাব্যের নাম লিখুন।

৪। কে, কোন কবিকে 'ভোরের পাখি' আখ্যা দিয়েছিলেন?

৫। রবীন্দ্রনাথ কোন কাব্যে মুক্তক ছন্দের প্রথম ব্যবহার করেন?

৬। কোন কবিতার জন্যে নজরুলকে কারাবরণ করতে হয়?

৭। আধুনিক কবিতাধারায় কবিপঞ্চক কাদের বলা হয়?

৮। কায়কোবাদের মহাকাব্যটির নাম ও বিষয় লিখুন।

৯। জীবনানন্দের বাংলার আবহমানকালের সৌন্দর্যকে নিয়ে লেখা কাব্যগ্রন্থের নাম ও প্রকাশ সাল লিখুন।

১০। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ও কবিতা সিংহের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী কী?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা', শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ওরিয়েন্ট, ১৯৬৩ সংস্করণ

২। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৩ থেকে ৫ খণ্ড), সুকুমার সেন, আনন্দ, ১৯৯৬ সংস্করণ

৩। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা', (২য়-৪র্থ পর্যায়), ভূদেব চৌধুরী, দে'জ, ২০০৩ সংস্করণ

৪। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (৪-১০ খণ্ড), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ, ২০০২ সংস্করণ

৫। 'আমার কালের কয়েকজন কবি', জগদীশ ভট্টাচার্য, ভারবি, ১৯৭৬

৬। 'সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়', পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ২০১৫ সংস্করণ

৭। 'লালন শাহ', আবুল আহসান চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০ সংস্করণ

৮। 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়', দীপ্তি ত্রিপাঠী, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩

৯। আধুনিক বাংলা কবিতা : বিচার ও বিশ্লেষণ, জীবেন্দ্র সিংহ রায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১

১০। আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়, অশ্রুকুমার শিকদার, নিউ এজ পাবলিকেশন ২০১৬

মডিউল-৩

বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের ইতিহাস

মডিউল (পর্যায়) ৩ : বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের ইতিহাস

গঠন

উদ্দেশ্য

একক ১৩ বাংলা নাট্য ও রঙ্গমঞ্চের আদিপর্ব ও রামনারায়ণ তর্করত্ন

১৩.১ বাংলা নাট্য ও রঙ্গমঞ্চের আদিপর্ব

১৩.২ রামনারায়ণ তর্করত্ন

একক ১৪ নাট্যকার মধুসূদন দত্ত ও নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র

১৪.১ নাট্যকার মধুসূদন দত্ত

১৪.২ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র

একক ১৫ নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক

১৫.১ নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন

১৫.২ গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক

একক ১৬ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক

একক ১৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক

একক ১৮ বিজয় ভট্টাচার্যের নাটক

অনুশীলনী

উদ্দেশ্য

আমাদের নির্বিশেষ উদ্দেশ্য হল মুক্তবিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের যে সকল শিক্ষার্থী, সাধারণ বিষয় হিসেবে বাংলাকে নির্বাচন করেছেন, তাদের সামনে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ) এর নাটক পর্যায়ের একটি কার্যকরী রূপরেখা তুলে ধরা। এছাড়া আরও কতকগুলি বিষয়, বিশেষ উদ্দেশ্যরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে, তা হল সাধারণ শিক্ষার্থীরা যে বিষয়গুলি এই স্ব-শিক্ষা-উপকরণ থেকে অবস্যই জানতে পারবে। যথা:

১. রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক

২. সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা শাসকের কোনো কাজের সমালোচনা কীভাবে নাটকে আসে এবং এপথে প্রথম যাত্রা কারা

৩. মধুসূদন কোন প্রেক্ষিতে জড়িয়ে পড়লেন নাটক রচনায়

৪. দীনবন্ধু কেন দায়বদ্ধ নাট্যকার

৫. নাট্যরচনায় গিরিশচন্দ্র কেন আপসকামী

৬. নাট্যনিয়ন্ত্রণের কালাকানুন ও তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল

৭. দ্বিজেন্দ্র নাটকের সাহিত্যমূল্য

৮. প্রথাগত বাংলা নাটক থেকে রবীন্দ্রনাটক কেন আলাদা এবং আজকের দিনে রবীন্দ্রনাটক প্রাসঙ্গিক কিনা

৯. পর্বান্তরের নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যপরিক্রমা ইত্যাদি।

বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের ইতিহাসকে বুঝতে গেলে এই মডিউলটি পাঠ করা জরুরি।

একক ১৩ ❑ বাংলা নাট্য ও রঙ্গমঞ্চের আদিপর্ব এবং রামনারায়ণ তর্করত্ন

১৩.১ বাংলা নাট্য ও রঙ্গমঞ্চের আদিপর্ব

নাটক সাহিত্য পরিবারের সদস্য কিন্তু অন্যরকমের। কবিতা বা গল্প, উপন্যাস মূলত পড়ার জন্য লেখা হয়ে থাকে, নাটকের বেলায় তা কিন্তু হয় না। নাটক পাঠ করে তার বিষয়বস্তু বোঝা যায় ঠিককথা, কিন্তু নাটককে ভালোমতো বোঝা যায় তার নাট্যরূপ বা মঞ্চরূপ দেখে। এটা শুধু বাংলা নাটকের জন্য নয়, সবদেশের নাটকের ক্ষেত্রে সত্য। তাই বলা হয় নাটকের প্রেরণা হল মঞ্চ বা থিয়েটার। এইজন্য নাটকের ইতিহাস জানতে বা পড়তে গেলে থিয়েটারের কথা এসেই যায়।

বাংলা নাটক আমরা প্রথম পাই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে। বাংলা নাটকের এই পথচলা কীভাবে শুরু হল এটা বুঝতে গেলে বাংলা থিয়েটারের আদিপর্বের ইতিহাস সামনে রাখতেই হয়।

আমরা জানি সপ্তদশ শতকের শেষ লগ্নে বিদেশি বণিকদের বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে কলকাতা নগরীর পত্তন ঘটে। এই নতুন কলকাতায় ক্রমশ বিদেশি বণিকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য কলকাতায় গড়ে উঠতে থাকে বিদেশি রঙ্গালয় বা থিয়েটার। সময়টা আঠার শতকের মাঝামাঝি। কলকাতার প্রথম বিদেশি থিয়েটার হল 'ওল্ড প্লে হাউস'। বিদেশি রঙ্গালয়গুলিতে ইংরেজি নাটকের অভিনয় চলতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে এই শতকের শেষের দিকে কলকাতায় এসে হাজির হলেন গেরাসিম লেবেডেফ (১৭৪৯-১৮১৭) নামে এক রাশিয়ান ভদ্রলোক। এলেন সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে, কিন্তু ক্রমশ তাঁর নজর গেল থিয়েটারের দিকে। তিনি বাঙালিকে আধুনিক থিয়েটারের রস উপভোগ করার সুযোগ করে দিলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন 'বেঙ্গলি থিয়েটার' (১৭৯৫)। অভিনীত হল বিদেশি নাটকের বাংলা অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল'। তাঁর সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে চক্রান্ত করে লেবেডেফকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেয় ইংরেজ থিয়েটার কর্তৃপক্ষ। এর প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর পর শিক্ষিত উচ্চবিত্ত বাঙালি আগ্রহী হয়ে উঠল থিয়েটার সম্পর্কে। নিজেদের বাগানবাড়িতে বা প্রাসাদকক্ষে গড়ে তুললেন নাটক অভিনয়ের মঞ্চ। একাজে প্রতম এগিয়ে এলে প্রসন্নকুমার ঠাকুর। তাঁর থিয়েটারের নাম 'হিন্দু থিয়েটার' (১৮৩১)। এখানে বাংলা নাটক অভিনীত হয়নি, অভিনীত হয় ভবভূতির 'উত্তরামচরিত' সংস্কৃত নাটকের ইংরেজি অনুবাদ। বাঙালির আদিপর্বের থিয়েটারে বাংলায় প্রথম অভিনীত হল শ্যামবাজারের নবীন বসুর নাট্যশালায়। এখানে অভিনীত হয় 'বিদ্যাসুন্দর'। এটি কোনো নাটক নয়, সেই সময়ের জনপ্রিয় কাব্যোপাখ্যান মাত্র। তবে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এর পরে দেখি, ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে বা প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকো থিয়েটারেও চলছে ইংরেজিতে নাট্যাভিনয়। আসলে বাংলা নাটক তখন কোথায়? ছিল না। তাই দেখা যায়, এই সময়ের শখের থিয়েটারগুলিতে অভিনীত হচ্ছে ইংরেজি নাটক। অদ্ভুত অবস্থা— মঞ্চ আছে, বাংলা নাটক নেই। তখন থেকে বাংলা নাটকের চাহিদা অনুভূত হতে থাকে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পাওয়া গেল প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক। একটি নয়, দু-দুটি নাটক। একটি হল জি সি গুপ্তের 'কার্তিবিলাস' (১৮৫২) আর অন্যটি হল তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২)। পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল দুজন নাট্যকার নাটক দুটি লিখেছিলেন। প্রথম বিয়োগান্তক, দ্বিতীয়টি মিলনাত্মক। আশ্চর্যের বিষয় নাটক দুটি অভিনীত হল না কোনো মঞ্চে। শেক্সপিয়রের ইংরেজি নাটকের অনুবাদ করতে দেখি, হরচন্দ্র ঘোষের মতো নাট্যকারকে। হরচন্দ্র কালিদাসের নাটকও অনুবাদ করেন বাংলায়। নন্দকুমার রায় অনুবাদ করেন কালিদাসের 'শকুন্তলা'। এই নাটকের অভিনয় দিয়ে উদ্বোধন হয় সেকালের কলকাতার আশুতোষ দেব ওরফে সাতুবাবুর বাড়ির নাট্যশালা (১৮৫৭)। এই বছরে আরও দুটি নাট্যশালা বাংলায় নাট্যাভিনয় শুরু করে। এগুলি হল জয়রাম বসাকের নাট্যশালা এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ এর বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। শেষোক্ত রঙ্গমঞ্চে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বেশি গুরুত্ব পায় বলা যায়। রামজয় বসাকের বাড়ির নাট্যশালার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে। ১৮৫৭-র মার্চে এই থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪)। এই প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক অভিনীত হয়। কৌলীন্য প্রথার বিরোধিতা করে লেখা এই নাটকের অভিনয় বেশ সাড়া ফেলে দেয়। গদাধর শেঠের বাড়ির নাট্যশালা এবং চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়ির নাট্যশালাতেও রামনারায়ণের এই নাটকটি অভিনীত হয়।

১৮৫৮তে প্রতিষ্ঠিত হয় পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া নাট্যশালা। এই নাট্যশালা শুরু করে রামনারায়ণের সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ 'রত্নাবলী' দিয়ে। এই নাটকের ইংরেজি অনুবাদ সূত্রে মধুসূদন দত্ত জড়িয়ে পড়লেন বাংলা নাটকের সঙ্গে তথা বাংলা রঙ্গালয়ের সঙ্গে। আর তার ফলে বাংলা নাটক শিল্পরীতির দিক থেকে যথাযথ হয়ে উঠল। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) তার প্রথম উদাহরণ। এই নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় 'বেলগাছিয়া নাট্যশালায়'। বলা যায় এই নাট্যশালার হাত ধরে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস একটি মাইলস্টোন অতিক্রম করে। এর পরের ধাপটি যার হাত ধরে অতিক্রান্ত হয়, সে হল ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালা (১৮৬৫)। আমোদ-প্রমোদ বা ধনসম্পদের জৌলুষ দেখানো এই থিয়েটারের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একাট নতুন নাট্যধারা সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়। এই থিয়েটারের অগ্রণী মানুষের হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মধুসূদনের একাধিক নাটক এই থিয়েটারে অভিনীত হয়। রামনারায়ণের 'নবনাটক' (১৮৬৬) এই থিয়েটারের একটি বিশেষ উদ্যোগের ফসল। এর প্রথম অভিনয় হয় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ করতেন নটী চরিত্রে অভিনয়। মুক্তোর মালা, হীরের গয়না পরে তিনি বসন্ত বর্ণনার গান গাইতেন। নটী যে আদতে একজন পুরুষ তা বোঝাই যেত না। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করতেন ঠাকুরবাড়ির আত্মীয় পরিজন এবং নিকট বন্ধুরা। প্রথমবারের অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন স্বয়ং। অভিনয় দেখে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। পরবর্তীকালের অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি নবনাটকের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'নবনাটক' এই থিয়েটারে মোট নয় বার অভিনীত হয়।

১৮৬৫তে প্রতিষ্ঠিত হয় আরও একটা থিয়েটার। এটি হল মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়। উদ্‌বোধন রজনীতে এখানে অভিনীত হয় ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' ও রামনারায়ণের প্রহসন 'যেমন কর্ম তেমনি ফল'। রামনারায়ণের একাধিক নাটক এই মঞ্চে অভিনীত হয়। সেই সময়ের প্রায় সব শখের থিয়েটারে রামনারায়ণের বহু নাটক অভিনীত হয়েছিল; তবে বেশি হয়েছিল এই থিয়েটারে। শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি ১৮৬৫ থেকে আবার অভিনয় শুরু করে। মধুসূদনের একাধিক নাটক এখানে মঞ্চস্থ হয়।

বাংলা নাট্য ও রঙ্গমঞ্চের আদিপর্বে 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার' একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এটি বড়োলোকদের ছিল না, ছিল বাগবাজার অঞ্চলের সাধারণ যুব সম্প্রদায়ের। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের আদিপর্বের ইতিহাসে বাগবাজার এমেচার থিয়োরি একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ১৮৬৭তে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠার পেছনে কলকাতার কোনো ধনী ব্যক্তি ছিলেন না, ছিলেন বাগবাজারের সাধারণ যুব সম্প্রদায়। দলে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি প্রমুখ। আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় এদের স্থায়ীমঞ্চ ছিল না। অভিনয়ও করতেন সাদামাটা নাটক; যাতে খরচ কম হয়। এদের প্রথম অভিনীত নাটক হল দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'। গিরিশ করেছিলেন নিমচাঁদ চরিত্র অভিনয় এবং বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নট হিসেবে নিজের জাত। 'সধবার একাদশী' এই থিয়েটারে বহুবার অভিনীত হয়। দীনবন্ধুর 'লীলাবতী'ও এরা মঞ্চস্থ করে! ১৮৭২-এর মাঝামাঝি নানাদ 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার' নাম পাল্টে হয়ে যায় শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'। 'লীলাবতী'র অভিনয় বহুল প্রশংসিত হয়। দর্শকদের জায়গা দেওয়া যাচ্ছিল না। এমনই এক পরিস্থিতিতে এরা টিকিট বিক্রির কথা ভাবতে থাকে। গিরিশচন্দ্র রাজি ছিলেন না। তাকে একরকম বাদ দিয়েই বলা যায় শ্যামবাজার নাট্যসমাজ থেকে গড়ে ওঠে ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭২)। বাংলার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়। সাধারণ মানুষ টিকিট কেটে নাটক দেখার সুযোগ পেল। বাংলা শখের থিয়েটার অতঃপর রূপান্তরিত হল বাণিজ্যিক থিয়েটারে। বাণিজ্যিক থিয়েটারে রূপান্তরের আগে পর্যন্ত এই হচ্ছে বাংলা থিয়েটারের আদিপর্বের ইতিহাস। এই ইতিহাস আমাদের জানায়, এই সময়ের সখের নাট্যশালার দাবিতেই বাংলার মৌলিক নাটক রচনা শুরু হয়েছে এবং আমরা পেয়েছি নতুন নতুন নাট্যকার। প্রথমেই যাকে পেয়েছি, তিনি হলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। তারপর একে একে এসেছেন উমেশচন্দ্র মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মনোমোহন বসু, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ।

১৩.২ রামনারায়ণ তর্করত্ন

আমরা প্রথম মৌলিক নাটক পাই ১৮৫২তে। দুটি নাটক— 'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুন'। নাট্যকার দুজন হলেন জি.সি. গুপ্ত এবং তারাচরণ শিকদার। নাটকদুটি কোনো থিয়েটারে অভিনীত হয়নি। প্রথম যে মৌলিক নাটকটি মঞ্চস্থ হয়, তার নাম হল 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪)। নাট্যকার হলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। প্রাক্ মধুসূদন পর্বের জনপ্রিয় নাট্যকার। তখনকার প্রায় সব সখের থিয়েটারে তাঁর নাটক অভিনীত হয়েছে।

তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল নাটুকে রামনারায়ণ' নামে।

রামনারায়ণ ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। জন্ম গ্রামে হলেও কলকাতায় জীবন কাটিয়েছিলেন অনেকটা। নাটক ও নাট্যাভিনয়ের প্রতি তাঁর যোগ অনেক আগে থেকে। গ্রামে সখের নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও কলকাতায় থাকাকালীন অনুভব করেছিলেন নতুন যুগের হাওয়া। তাই রক্ষণশীল না হয়ে, হয়ে উঠেছিলেন সমাজ সংস্কার আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক।

রামনারায়ণ প্রবন্ধ রচনা দিয়ে শুরু করেছিলেন তাঁর লেখালেখি। তবে নাটক হল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ক্ষেত্র। নাট্যকার হিসেবে তাঁর আবির্ভাব ১৮৫৪-তে। আর শেষ নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৭৩তে। সব মিলিয়ে প্রায় ১৩টি নাটক আমরা তার হাত থেকে পেয়েছি। এর মধ্যে রয়েছে চারটি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। যথা— 'বেণীসংহার নাটক', 'রত্নাবলী নাটক', 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাটক' এবং 'মালতীমাধব নাটক'। পৌরাণিক নাটকগুলি হল 'রুক্মিণীহরণ', 'ধর্মবিজয়' এবং 'কংসবধ নাটক'। প্রহসন লিখেছিলেন তিনটি— 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'উভয়সঙ্কট' এবং 'চক্ষুদান'। আর যে দজুটি নাটকের কথা না বললেই নয়, তা হল তাঁর দুটি সমকালীন সমাজসমস্থামূলক নাটকের কথা। নাটক দুটি হল 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) এবং 'নবনাটক' (১৮৬৬)।

আমরা আগেই জানিয়েছি, 'কুলীনকুলসর্বস্ব' প্রথম মৌলিক নাটক, যা মঞ্চস্থ হয়েছিল। কিন্তু কোনো মঞ্চের বিশেষ তাগিদে এই নাটক রচিত হয়নি। এই নাটক রচিত হয়েছিল প্রগতিশীল বিদ্যোৎসাহী জমিদারের 'ফরমায়েসে'। আসলে কৌলীন্যপ্রথার কুফল দেখিয়ে নাটক রচনার যে প্রতিযোগিতা জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী বলেছিলেন, তার শ্রেষ্ঠ রচনাটি হল রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'। এর জন্য তিনি ৫০ টাকা পারিতোষিক পেয়েছিলেন। সংস্কৃত নাট্যরীতিতে নাটকটি রচিত। নাটকে দেখানো হয়েছে কৌলীন্য নামক কুপ্রথার দরুণ কীভাবে কুলীনকন্যাদের জীবন বিপর্যস্থ হচ্ছে, তার নিষ্করুণ ছবি। তবে উপস্থাপন ভঙ্গিটি রঙ্গব্যঙ্গমূলক। পুরুষচরিত্রগুলি সংলাপের জন্য আড়ষ্ট তুলনায় নারীচরিত্রগুলি জীবন্ত। পুরুষচরিত্রগুলির নামগুলি বেশ মজার— যেমন, অধর্মরুচি, বিবাহবণিক, উদরপরায়ণ, বিবাহবাতুল ইত্যাদি। আসলে নাম দিয়েই চরিত্রগুলি চেনা হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত নাটকটির বক্তব্য বেশ জোরালো— দায়বদ্ধ শিল্পকর্ম হিসেবে উল্লেখযোগ্য রচনা। এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করতে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল তখনকার ভাটপাড়ার কুলীন ব্রাহ্মণেরা।

রামনারায়ণের দ্বিতীয় সমাজসমস্যামূলক নাটকটি হল 'নবনাটক'। এটিও একধরনের 'ফরমায়েসি' রচনা। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কর্তৃপক্ষ ১৮৬৫তে বহুবিবাহের কুফল দেখিয়ে একটি ভালো নাটকের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়। তাতে তেমন ভালো কোনো নাটক পাওয়া যায়নি। তখন রামনারায়ণকে এ বিষয়ে একটি নাটক রচনার অনুরোধ করা হয়। তারই ফল হল 'নবনাটক'। এর জন্য নাট্যকার পুরস্কৃত ও সংবর্ধিত হন। উদ্দেশ্যমূলক এই নাটকে দেখানো হয়েছে স্ত্রী-পুত্র সত্ত্বেও এক জমিদারের দ্বিতীয় বিবাহ এবং তার

দরুন চরণ বিপর্যয়। প্রাচ্য নাট্যরীতিতে রচিত এই নাটকের চরিত্রের নামগুলি ও চরিত্রের অন্তঃপ্রকৃতি কিছুটা হলেও ধরিয়ে দেয়। উপস্থাপনে রঙ্গব্যঙ্গের আমেজ থাকলেও পরিণতিটি বিয়োগান্তক। সব মিলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম শরিক হয়ে উঠেছে এই নাটক। নাটকের নামকরণেও তারই ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে।

'যেমন কর্ম তেমনি ফল' রামনারায়ণের উল্লেখযোগ্য প্রহসন। দুই অঙ্কের এই প্রহসনে রয়েছে পরস্ত্রীর প্রতি অবৈধ আসক্তি এবং তার হাস্যকর শাস্তি। প্রহসনটি দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী'র কথা মনে পড়িয়ে দেয়। নাটকের মুন্সের চরিত্রের মধ্য দিয়ে রামনারায়ণ তখনকার মূর্খ, অযোগ্য, পক্ষপাতী মুন্সেফ সমাজের উপর এক হাত নিয়েছেন বলা যায়। 'চক্ষুদান' প্রহসনটি লাম্পট্য ব্যাধির প্রতিকারের উদ্দেশ্যে রচিত। নাট্যকার এই প্রহসনের মধ্য দিয়ে তখনকার লাম্পট্যদুষ্ট সমাজের চক্ষুদান করতে চেয়েছেন বলা যায়। 'উভয়সংকটে' রয়েছে সপত্নী সমস্যার সরস অবতারণা। বড়ো বৌ, ছোটো বৌ এবং গয়লানী— তিনটি চরিত্র বাস্তবধর্মিতায় উজ্জ্বল। এই ধরনের রচনায় নাট্যকারের সামর্থ্য এইভাবে চিহ্নিত করেছেন নাট্য-সমালোচক ড. অজিতকুমার ঘোষ: ব্যঙ্গের হুল এবং শ্লেষের খোঁচা যে, সমাজ মন শোধন করিতে— তত্ত্বোপদেশের গদাঘাত অপেক্ষা অনেক বেশি কার্যকর, রামনারায়ণের প্রহসন তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

পুরাণ অনুসরণে রামনারায়ণ করতগুলি নাটক লিখেছিলেন আমরা জানি। এই নাটকগুলিতে তিনি পুরাণের অন্ধ অনুকরণ করেননি। পৌরামিক বৃত্তান্তকে নিজের মতো করে নাট্যরসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন বলা যায়। বিশেষভাবে এই কথা প্রযোজ্য তাঁর 'রুক্মিণী হরণ' নাটক প্রসঙ্গে। সরল, লোভাতুর, তোতলা ব্রাহ্মণ ধনদাসকে সহজে ভোলা যায় না। বাকি দুটি পৌরাণিক নাটক 'কংসবধ' ও 'ধর্মবিজয়' সেভাবে উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

নাট্যকার রামনারায়ণ বিশেষত দুটি কারণে আমাদের কাছে আজও স্মরণীয়। প্রথমত, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের আদিপর্বে যখন মৌলিক নাটকেরই আকাল, তখন তিনি রসোত্তীর্ণ বাংলা নাটক দিয়ে বাঙালির নাট্যচর্চাকে অব্যাহত রেখেছেন। দ্বিতীয়ত, সমকালীন যুগের চাহিদাকে অস্বীকার করেননি। তাঁরই হাত ধরে আমরা প্রথম পেয়েছি প্রতিবাদী বাংলা নাটক। তাঁর প্রতিবাদের ধরন ভিন্ন। তাই প্রতিবাদী নাট্যকারদের তালিকায় আমরা অনেক সময় দীনবন্ধু মিত্রের নাম যত সহজে উচ্চারণ করি, রামনারায়ণকে সেভাবে মনে রাখি না। রামনারায়ণের নাট্যভাবনা মূলাধার যে প্রখর সমাজচেতনা, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। রামনারায়ণের এই নাট্যভাবনা যে সেদিনের প্রেক্ষিতে রীতিমতো ঈর্ষণীয়, বা বলার অপেক্ষা রাখে না। কলাকৈবল্যবাদীদের ছুৎমার্গকে নস্যাৎ করে তিনি নির্ভুলভাবে তুলে ধরেছেন সাহিত্য ও সমাজের অচ্ছেদ্য সম্পর্কটিকে। আজ থেকে দেড়শো বছরেরও বেশি আগে, একজন 'চুলো' পণ্ডিত বুঝে গেলেন নাটক নিছক বিনোদনের বস্তু নয়, সমাজসচেতন স্রষ্টার দায়বদ্ধতা প্রকাশের হাতিয়ার ওটা— আমাদের বিস্মিত না করে পারে না।

একক ১৪ ❑ নাট্যকার মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র

১৪.১ নাট্যকার মধুসূদন দত্ত

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্ত কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত— বিশেষত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক হিসেবে। কিন্তু কবির পাশাপাশি মধুসূদন দত্ত ছিলেন নাট্যকারও। নিছক সাধারণ নাট্যকারমাত্র নন, বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিবর্তনে তাই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আমরা জানি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্যানুসারী বঙ্গরঙ্গমঞ্চের চাহিদায় বা প্রেরণায় বাংলা নাট্যসাহিত্য পথচলা শুরু করে। জি.সি.গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার, রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও উমেশচন্দ্র মিত্রদের নাট্যচর্চায় বাংলা নাটক সুস্পষ্ট অবয়ব লাভ করেনি। বলা যায় মধুসূদন দত্তের হাতে বাংলা নাটক প্রথম একটা শৈল্পিক রূপ-স্বরূপ পাওয়ার প্রচেষ্টায় সফল হল। আর এটা মধুসূদন করতে পেরেছিলেন পাশ্চাত্য নাট্যরীতি সম্বন্ধে তার জানা-বোঝা থেকে।

আমরা আগেই বলেছি, নাট্যকার মধুসূদনের প্রথম পরিচয় নয়, দ্বিতীয় পরিচয়। যদিও বাংলাতে তিনি প্রায় কাব্য বা কবিতা লেখেননি, লিখেছিলেন নাটক। তবে তাঁর এই নাটক লেখার ব্যাপারটা হৃদয়ের স্পতঃস্ফূর্ততায় ঘটেনি, ঘটেছিল পাকেচক্রে বা বলা যায় পরিস্থিতিচক্রে। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ১৮৫৮তে চলছিল রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুবাদ নাটক 'রত্নাবলী'র অভিনয়। অভিনয় দেখতে এসেছিলেন গণ্যমান্য অতিথিরা— এর মধ্যে ইংরেজরাও ছিলেন। ইংরেজ দর্শকদের জন্য 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বুঝতে পারলেন সেই সময়কার বাংলা নাট্যচর্চার গতিপ্রকৃতি। বুঝলেন 'অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রায়ে বঙ্গে'। পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালি দর্শকদের জন্য 'যথাযথ' বাংলা নাটক লেখায় লেগে পড়লেন। বলা যায়, অসাধ্য সাধন করলেন তিনি। বাংলা ভাষায় 'কাঁচা' মধুসূদন আমাদের উপহার দিলেন আস্ত একটি নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) বাংলা সাহিত্যে কবি মদুসূদনের আগেই আবির্ভূত হলেন নাট্যকার মধুসূদন।

মধুসূদন পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছিলেন মোট ৬টি। নাটকগুলি হল যথাক্রমে 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী', 'মায়াকানন', 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। 'মায়াকানন (১৮৭৪) মধুসূদনের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে একটি অসমাপ্ত নাট্যরচনা রয়েছে।

'শর্মিষ্ঠা' নাটকের কাহিনি নেওয়া হয়েছে মহাভারতের আদিপর্ব থেকে। নাটকটি গনে উঠেছে শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতি ত্রিকোণ প্রেমকে নিয়ে। পুরাণের কাহিনি নিয়ে এই নাটকের আখ্যান গড়ে উঠলেও অন্তঃপ্রকৃতিতে একে পৌরাণিক নাটক বলা যায় না। যদিও শিল্পী মধুসূদনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব এই

নাটকের বাইরে-ভেতরে বেশ বোঝা যায়। কাহিনি নির্বাচন ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাচ্যের প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। প্রাচ্যের প্রভাব মেনেই নাটকের 'মধুরেণসমপয়েৎ' করেছেন। অথচ নাটকটি লেখার আগে তিনি পাশ্চাত্য নাট্যতত্ত্বের পক্ষে যে জোরালো সওয়াল করেছিলেন, কার্যক্ষেত্রে তা অনেকটাই পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় পারিপার্শ্বিকতার চাপে শিল্পী মধুসূদনের এটা একধরনের আপস। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি অবয়বের দিক থেকে নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্যপন্থী। বাংলা নাটকে এই প্রথম পঞ্চাঙ্ক মডেলকে আমরা পেলাম।

দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' (১৮৬০)তে মধুসূদন গ্রিক পুরাণের ভারতীয় রূপান্তর ঘটিয়েছেন। পদ্মাবতীর জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তিন দেবীর (শচী, রতি ও মুরজা) সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্বময় পটভূমিকা। নাটকের শ্রেষ্ঠ চরিত্র অবশ্যই শচী। শেষপর্যন্ত নাটক হিসেবে 'পদ্মাবতী'কে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না। মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)। 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এটি একইসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথাযথ ঐতিহাসিক নাটক এবং প্রথম সার্থক ট্রাজেডি। ইতিহাসের কাহিনি নিয়ে লেখা হলেই ঐতিহাসিক নাটক হয় না। ইতিহাস ও সৃজনশীল কল্পনার মেলবন্ধন ঘটানো হয় ঐতিহাসিক নাটকে। মধুসূদন সেই কঠিন কাজটি 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে করতে পেরেছেন। নাটকের বিষয় গৃহীত হয়েছে কর্নেল জেমস্ টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan' গ্রন্থ থেকে। যদিও এই বইটি খাঁটি ইতিহাস নয়, এটি আসলে কিংবদন্তীমূলক গ্রন্থ। এই গ্রন্থকে অন্ধভাবে অনুকরণ করেননি, বরং নাটকের প্রয়োজনে গ্রহণ-বর্জন করেছেন কাহিনিগত দিক থেকে এবং চরিত্রগত দিক থেকে। এছাড়া নাটকের পটভূমিতে ইতিহাসের সেই সময়কে যথাসম্ভব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি শিল্পকলা মধুসূদন তাঁর এই নাটকে সফলভাবে প্রয়োগ করেছেন। ট্র্যাজেডি হল ব্যক্তিমানুষের অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় বা শোকাবহ পরিণতি। এই নাটকে দেখি উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর পানিগ্রহণের জন্য জংসিংহ ও মানসিংহ ভীমসিংহের কাছে উপস্থিত। কৃষ্ণকুমারীকে না পেলে দুই ক্ষমতাশালী রাজাই জানিয়ে দেয় উদয়পুরকে ধ্বংস করার কথা। এদিকে ভীমসিংহ অক্ষম রাজা ও স্নেহাতুর পিতা। ফুলের মতো নিষ্পাপ কৃষ্ণকুমারীকে যদি রক্ষা করতে চান, তাহলে দেশ বা রাজ্যের বিপদ। আর যদি দেশকে বাঁচাতে চান তাহলে কন্যাকে বিসর্জন দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এমন পরিস্থিতিতে ভীমসিংহ নিজের কন্যাকে বলি দিতে উদ্যত হলেন। কৃষ্ণকুমারীর আত্মবিসর্জনে দেশরক্ষা পেল, কিন্তু রাজা নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না। নিদারুণ দুঃখগ্লানিতে ভীমসিংহের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেল। নাটকের এই পরিণতি নিঃসন্দেহে ট্র্যাজিক। গঠন এবং ভাবনার দিক থেকে এই নাটকে পাশ্চাত্য নাট্যকলা চরম শিল্পরূপ লাভ করেছে।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের তেরো বছর পরে মধুসূদন রচনা করেন 'মায়াকানন'। জীবনের শেষপ্রান্তে লেখা এই নাটকেও বিয়োগান্তক পরিণতি আছে। কিন্তু এই পরিণতিকে আটকানোর জন্য কোন লড়াই নেই। বরং রয়েছে দৈবঘটিত দুঃখের কাছে নিরুপায় মানুষের কাছে প্রতিবাদহীন আত্মসমর্পণ। নাটক হিসাবে

মায়াকানন উল্লেখযোগ্য বলা যায় না। তবে এর মধ্যে অনুভব করা যায় শিল্পী মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের বিয়োগান্তক পরিণতির সুর।

শিল্পের বিচারে মধুসূদনের প্রহসন দুটি খুব উচ্চাঙ্গের রচনা। 'একেই কি বলে সভ্যতা'তে আমরা পাই পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ-অনুকরণে বিপথগামী তরুণ ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর ভ্রষ্টাচার। একেই বিদ্রূপের কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন নাট্যকার। নক্সার আকারে এখানে ধরা পড়েছে তখনকার কলকাতায় ইংরেজদের বর্ণবিদ্বেষ, বারবণিতার বাড়াবাড়ি, বৈষ্ণবের অসাধুতা, পুলিশ প্রশাসনের উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি নানা ঘটনা। তবে মধুসূদনের এই রচনা নক্শা হয়ে থেকে যায়নি, হয়ে উঠেছে উচ্চাঙ্গের নাট্যকর্ম। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) এর ঘটনাস্থল হল গ্রামবাংলা। এই প্রহসনের মূল বিষয় হল গরীব চাষি হানিফের স্ত্রী ফতেমার প্রতি বকধার্মিক জমিদার ভক্তপ্রসাদের লোলুপ দৃষ্টিও শেষপর্যন্ত তার যথোচিত শাস্তিবিধান। জমিদার ভক্তপ্রসাদের চারিত্রিক অসঙ্গতি নির্ভুলভাবে তুলে ধরেছেন প্রহসনকার মধুসূদন। ভক্তপ্রসাদের মধ্যে আমরা দেখি, মুসলমান নারী সংসর্গে আসক্তি অথচ মুসলমান-ছোঁয়া খাদ্য সম্বন্ধে তাঁর ভয়ানক আতঙ্ক। প্রহসনটিতে মধুসূদন ছড়া, প্রবাদ এবং কবিতার অংশবিশেষ ব্যবস্থার করে রচনাটিকে সরস ও কৌতুকপূর্ণ করে তুলেছেন। তবে শিল্পগুণের বিচারে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' অপেক্ষা 'একেই কি বলে সভ্যতা' উন্নতমানের রচনা।

বাংলাসহিত্যে মধুসূদন এক বড় প্রতিভা। সেই মধুসূদন ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছিলেন বাংলা নাটক রচনার সঙ্গে। এই ঘটনায় ব্যক্তি মধুসূদনের লাভালাভের পরিমাণ আমরা জানি না, কিন্তু বেশ বুঝতে পারি বাংলা নাটক এতে উপকৃত হয়েছিল দারুণভাবে। বলা যায়, মধুসূদনের সক্রিয় উদ্যোগে বাংলা নাটক আধুনিকতার চৌকাঠে পদার্পণ করে। মধুসূদনই প্রথম পাশ্চাত্য নাট্যরীতিকে বাংলা নাটকে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করলেন। বৃত্ত বা প্লট এল। প্লটের জন্ম হল দ্বন্দ্ব বা সংঘাত থেকে। এলিজাবেথিয়ান পঞ্চাঙ্ক মডেল এল। অঙ্কগুলি গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যে বিভক্ত হল। এগুলি প্রাক্ মধুসূদন পর্বে বাংলা নাটকে ছিল না। তবে একথা ঠিক নাটক সম্বন্ধে মধুসূদনের জানা-বোঝা যতটা ছিল, ততটা তিনি প্রয়োগ করে দেখিয়ে যেতে পারেননি। আসলে তাঁর ভেতরে-বাইরে কাজ করছিল নানা ধরনের টানাপোড়েন। এতৎসত্ত্বেও বাংলা নাট্য সাহিত্যকে যা দিয়েছেন তার পরিমাণ অল্প নয়। প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক নাটক দিয়েছেন। দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি। তাঁর হাত থেকেই পেয়েছি উচ্চাঙ্গের প্রহসন। এই প্রহসন সংস্কৃত প্রহসন বা ইংরেজি ফার্স-এর তুলনায় উঁচু জাতের। প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক প্রকাশের সাত-আট বছরের মাথায় বাংলা নাটকের হাল ধরে তাকে এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি।

১৪.২ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র

নাট্যরচনার দিক থেকে দীনবন্ধু মিত্র মধুসূদন দত্তের প্রায় সমসাময়িক। তবে নাট্যকার হিসেবে মধুসূদনের আবির্ভাব দীনবন্ধুর চেয়ে একটু হলেও আগে। মধুসূদনের প্রধান পরিচয় নাট্যকার না হলেও দীনবন্ধুর প্রধান পরিচয় তিনি নাট্যকার। মধুসূদনের সমস্ত সাহিত্যকর্ম যেখানে শিল্পের জন্য উৎসর্গীকৃত, সেখানে দীনবন্ধুর নাট্যচর্চা সমকালের মুখ চেয়ে; ওরকম বলা যায় যুবার দাবিতে। নাট্য-অভিব্যয়ের এই ভিন্নতার কারণে দীনবন্ধুর নাটক সমকালের বৃহত্তর সমাজজীবনের সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে পারেনিৱ। আক্ষরিক অর্থেই দীনবন্ধুর নাটক হয়ে উঠেছে সমকাল-সমাজজীবনের দর্পণ। আর দীনবন্ধু হয়ে উঠেছেন দর্পণ নাট্যধারার প্রবর্তক।

মধুসূদনের জীবন যেখানে ছিল রাজ-আনম্বরে লালিত-পালিত, সেইরকমই ভাঙা-গড়া; সেখানে দীনবন্ধুর জীবন বেড়ে-ওঠা নিতান্তই সাদামাটা। জন্মেছিলেন কাঁচরাপাড়ার কাছে এক গ্রামে। গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনার পরে পরেই পারিবারিক অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে তাঁকে নিতে হয়েছিল জমিদারি সেরেস্তার কাজ। কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্য সে কাজ ছেড়ে কলকাতায় এলেন কাকার বাড়িতে। করতে হত নানারকম শারীরিক পরিশ্রমের কাজ। হিন্দু কলেজের পাঠ অসমাপ্ত রেখে আবার তাঁকে সাংসারিক কারণে গ্রহণ করতে হয় চাকরি— পোষ্টমাস্টারের কাজ। পদোন্নতি পেয়ে হয়েছিলেন ইন্সপেক্টিং পোষ্টমাস্টার। এই কাজের জন্য তাঁকে নানা জায়গা ঘুরতে হত। শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ জীবন— তার সমস্যা কাছ থেকে দেখলেন। লাভ করলেন বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতা। ইতিমধ্যে কলকাতা যাওয়ার পরে-পরেই দীনবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে গুপ্তকবি তথা সংবাদপ্রভাকর সম্পাদকের। আর পাঁচটা বাঙালি যুবকের মতো কবিতা রচনায় হাত দিলেন। 'সংবাদ প্রভাকর' বেশ কয়েকটি কবিতা একটি কাব্য প্রকাশও পায়। কিন্তু তাঁর ভেতরে প্রস্তুতি চলছিল অন্যকিছুর; তাই কবি না হয়ে দীনবন্ধু হলেন নাট্যকার। তাঁর শিল্পীসত্তার স্বতঃস্ফূর্তি নাটকের মধ্যেই প্রকাশ পেল।

দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) আর শেষ নাটক হল 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) এর মাঝে রয়েছে আরও পাঁচটি নাট্যরচনা। রচনাগুলি হল— 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'বিয়ে পাগলা বুরো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'লীলাবতী' (১৮৬৭) এবং 'জামাইবারিক' (১৮৭২)।

'নীলদর্পণ' শুধু দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত রচনা নয়, বাংলা নাট্যসাহিত্যের স্মরণীয় রচনা। এই নাটকের বিষয় হল, নীলচাষীদের উপর নীলকর সাহেবের অমানবিক অত্যাচার। নীলচাষ ব্যাপারটা এখন আমাদের অজানা। আসলে সভ্যতার বিবর্তনে নীলচাষ করার প্রয়োজনটাই উঠে গেছে। কিন্তু উনিশ শতকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষত বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে নীলচাষ হত। তারই স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ 'বাংলার বিভিন্ন জায়গায় এখনও নীলকুঠির ভগ্নস্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। যাই হোক,

পরাধীন ভারতবর্ষ তথা বাংলায় নীলচাষ এক লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয় আর এই ব্যবসার মালিক হয়ে ওঠে ইংরেজরা। এদেরকে বলা হত নীলকর সাহেব। এরা নিজেদের মুনাফার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য এদেশের নীলচাষীদের উপর নানারকম জুলুমবাজি করত; এমনকি তাদের লোলুপতার হাত নীলচাষীদের অন্তঃপুরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এক কথায় বলা যায়, নীলচাষীরা ধনেপ্রাণে মারা যাওয়ার মতো অবস্থায় পড়ে। দীনবন্ধু কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে প্রজাদের এই দুরবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সহমর্মিতায় তাঁর হৃদয় এতে প্রবলভাবে নাড়া পায়। আর পাঁচজন শিক্ষিত বাঙালির মতো তাঁর মনে হয়েছিল ব্রিটিশ শাসকদের উপরের লোকজন এইসব অন্যায় অত্যাচারের কথা জানে না, জানলে এইসব উপদ্রব বন্ধ হবে। এই ভাবনা থেকে তিনি রচনা করেন 'নীলদর্পণ' নাটক। নাটকটি তিনি স্বনামে প্রকাশে করেননি। কারণ তিনি তখনও ডাকবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁর উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হয়েছিল বলা যায়। তখনকার শিক্ষিত মহলে নাটকটি ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয়। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশে আলোড়ন তোলার ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর পাশাপাশি আর একটি মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তিনি হলেন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'নীলদর্পণ' নাটকে হরিশ মুখোপাধ্যায়ের কথা আছে।

'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকরদের অত্যাচারের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দুটি পরিবার। একটি হল সম্পন্ন বসু পরিবার আর অন্যটি হল সাধারণ কৃষক পরিবার। নীলকরদের অত্যাচারে গ্রাম বাংলার পরিবারগুলি কীভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তারই নির্ভুল ছবি তুলে ধরেছেন দীনবন্ধু। কৃষককন্যা ক্ষেত্রমণির উপর রোগসাহবের পাশবিক অত্যাচার ও তার দরুণ ক্ষেত্রমণির মৃত্যু— কোনো বানানো গল্প নয়; দীনবন্ধু নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করা অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন। তবে 'নীলদর্পণ' একতরফা অসহায় আত্মসমর্পণের আলেখ্য নয়; সামান্য হলেও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রজাসাধারণের লড়াই, পাল্টা মারের কথা আছে। ঐতিহাসিক বিচারে 'নীলদর্পণ' তাই বাংলা সাহিত্যে তুলনাহীন। শিল্প বিচারে ত্রুটি বিচ্যুতি অবশ্যই আছে। তথাকথিত উচ্চশ্রেণির পুরুষচরিত্রগুলি সংলাপের কারণে জীবন্ত হতে পারেনি; কিন্তু আদুরী, তোরাম কিংবা পদীময়রাত্রীর চরিত্রগুলি নাট্যকারের অসাধারণ শিল্পপ্রতিভার পরিচায়ক। সমকালীন দেশকালের চালচিত্র এই নাটকে অতি বিশ্বস্থতার সঙ্গে ধরা পড়েছে।

'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩) দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাট্যরচনা। দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার পরিচয় এর মধ্যে আমরা পাই না। আসলে নীলদর্পণ এর পর দীনবন্ধু তাঁর কলমের অভিমুখ বদলে ছিলেন। তিনি বাস্তবের রুক্ষ মাটি ছেড়ে রোমান্স রসের কারবারী হতে চাইলেন। কিন্তু সকলের জন্য সব কিছু নয়। দীনবন্ধু ঠিক এই জায়গাটিতে এসে ব্যর্থ হলেন। 'নবীন তপস্বিনী'তে দুটি কাহিনিকে মেলানো হয়েছে। একটি গুরুগম্ভীর প্রেমকাহিনি; অন্যটি হাস্যরসাত্মক। প্রকৃতপক্ষে কাহিনি দুটি একাত্ম হতে পারেনি, ফলে নাটকের ঐক্য নষ্ট হয়েছে। সব মিলে 'নবীন তপস্বিনী' দীনবন্ধুর দুর্বল নাট্যরচনা। দীনবন্ধুর শেষ নাটক 'কমলে কামিনী'র

ক্ষেত্রেও ঠিক তাই বলা চলে। এই নাটকেও গুরুগম্ভীর কাহিনির সঙ্গে হাস্যরসের সংযোগ ঘটানো হয়েছে জোর করে। নাট্যসাহিত্যের ঐতিহাসিক ড. অজিত কুমার ঘোষ তাই সঙ্গত মন্তব্য করেছেন:

> দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকে হাস্যরসই প্রাণ, কিন্তু এই নাটকে হাস্যরস অনেকস্থলেই মূল রসের পরিপন্থী এবং বিরক্তিজনক হয়েছে।

তাই নাটক হিসেবে 'কমলে কামিনী'ও ব্যর্থ বলা যায়। 'লীলাবতী' (১৮৬৭) প্রেম ও প্রেমের ঘাতপ্রতিঘাতমূলক নাটক। এই রোমান্টিক কমেডি রচনাতেও দীনবন্ধু অসফলই বলা যায়। লীলাবতীর মিলনানন্দ ও বিরহবেদনা পাঠক-দর্শককে একাত্ম করে না, বরং তাদের মনে বিরক্তি আনে। সমকালীন বিভিন্ন বিষয় এই নাটকে রয়েছে। যেমন— কৌলীন্যপ্রথার অনিষ্টকারীতা, স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, ব্রাহ্ম-আন্দোলন ইত্যাদি। কিন্তু বিষয়গুলিকে নাটকের অচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করতে পারেননি। বরং বিচ্ছিন্নভাবে নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদ চরিত্রগুলিকে আমাদের খারাপ লাগে না; তাদের জন্য একদিনে, অনুকম্পা জাগে আমাদের মনে।

দীনবন্ধু তিনটি প্রহসনধর্মী নাটক রচনা করেছিলেন। রচনা তিনটি হল 'সধবার একাদশী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' এবং 'জামাইবারিক'। এর মধ্যে 'সধবার একাদশী' বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। বাইরে থেকে মনে হয়, মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুকরণে 'সধবার একাদশী'। দুটি রচনার বিষয়বস্তু প্রায় এক। দুটিতেই রয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে নব্যবঙ্গীয় যুবক ভ্রষ্টাচার। প্রশ্ন উঠতেই পারে, মধুসূদনের রচনার ছ'বছরের মাথায় একই বিষয় নিয়ে দীনবন্ধু কেন প্রহসনধর্মী নাটক লিখলেন এর উত্তরে বলা যায়, মধুসূদনের প্রহসনে শুধুমাত্র সমাজের উপরিতলের অসঙ্গতির ছবি রয়েছে; দীনবন্ধু সেখানে উপরিতলের পাশাপাশি তার ভেতরের-তলদেশের চিত্রটিও খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তার ফলে 'সধবার একাদশী'তে শুধুমাত্র অচলদের মাতলামি লাম্পট্যের ছবি নেই; রয়েছে নিমচাঁদের মতো উচ্চশিক্ষিতের অন্তর্বেদনার গোপন ছবি। যুগসন্ধিকালের সার্বিক অবক্ষয় নিমচাঁদকে হতাশাগ্রস্ত করে। বলাবাহুল্য তার নিজের জীবনে ব্যর্থতাও এর সঙ্গে যুক্ত। হতাশা থেকে সাময়িক মুক্তি পাওয়ার জন্য সে অচলদের সঙ্গে মেশে এবং মদ খায়। শেষপর্যন্ত এ গল্প শুধু উনিশ শতকের থাকে না; হয়ে ওঠে সর্বকালের। আর তখনই 'সধবার একাদশী' নিছক প্রহসন থাকে না, হয়ে ওঠে রসোত্তীর্ণ পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই নাটকের নিমচাঁদ শুধু দীনবন্ধুর চরিত্রচিত্রশালাতে নয়, বাংলা নাটকের চরিত্রমালায় এক উল্লেখযোগ্য নাম। এই নাটকের সংলাপের অশ্লীলতা নিয়ে সমকালে প্রশ্ন উঠেছে। সবমিলে উনিশ শতকের বিতর্কিত রচনার তালিকায় 'সধবার একাদশী' এসেই যায়।

মধুসূদনের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন অনুসরণে রচিত দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'। নিখুঁত হাস্যরস প্রধান প্রহসন হিসেবে এটি একটি অপূর্ব রচনা। এর মধ্যে ধারালো কথার তীব্র ঝলক নেই, নেই কোনো গুরুগম্ভীর সমাজ সমস্যার ইঙ্গিত; বরং হাস্যরসের অনর্গল ধারায় প্রহসনটি আগাগোড়া স্নিগ্ধ

ও মধুর। বিয়ে পাগলা বুড়ো রাজীবলোচন উপহাসের লগুড়াঘাতে পেয়েছে যথোচিত শাস্তি। হাস্যরসের প্রাবল্যে 'জামাইবারিক', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'কেও ছাড়িয়ে যায়। 'জামাইবারিক' এর বিষয় কুলীন ঘরজামাইদের মর্মযন্ত্রণা। কিন্তু সমস্তটা উপস্থাপিত হয়েছে হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে। আসলে প্রহসনটি স্ত্রী-ভূমিকা প্রধান। আর এই অন্তঃপুরিকাদের রঙ্গরস, হাসিঠাট্টা, কলহ দীনবন্ধু অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

দীনবন্ধু সাতটির মতো নাটক লিখেছেন— এর মধ্যে তিনটি (নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী ও কমলে কামিনী) শিল্পগুণে উত্তীর্ণ নয়। অর্থাৎ হাতে থাকে মাত্র চারটি রচনা। এই চারটি রচনার বিনিময়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদিপর্বে দীনবন্ধু হয়ে উঠেছেন একজন শক্তিশালী নাট্যকার। তখনই আমরা বুঝতে পারি। সংক্যাটাই সবকিছু নয়। দীনবন্ধুর হাত থেকে আমরা প্রথম পেলাম শাসকবিরোধী গণজীবনের নাটক। প্রভাবশালী ক্ষমতাশালী মানুষের অত্যাচার-অনাচার তুলে ধরতে নাটকের নামকরণে 'দর্পণ' শব্দটি যে সার্থকতায় প্রয়োগ করেন দীনবন্ধু, বাংলা নাট্যসাহিত্যে তার প্রভাব গভীর। বাংলা নাট্যসাহিত্যে 'দর্পণ' নাটকের একটা ধারাই তৈরি হয়ে যায়। মধুসূদনের হাতে প্রহসন আমরা আগেই পেয়েছিলাম। দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' কিংবা 'জামাইবারিক' মধুসূদনের প্রহসনের সাফল্যকে অতিক্রম করতে পারে না, আমরা মানি। কিন্তু 'সধবার একাদশীতে দীনবন্ধু যা করেছেন, সেকালের প্রেক্ষিতে তারা যায় না। 'সধবার একাদশী' সেকালের প্রেক্ষিতেও বটেই, একালের সাধারণ পাঠকের কাছে 'জলবৎ তরলম্' নয়। অথচ ব্যঞ্জনাগতভাবে এ নাটক সেকালকে অতিক্রম করে একালকেও ছুঁয়ে যায়। দীনবন্ধু নিজে সরাসরি কোনো রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না; কিন্তু সেই সময়ের রঙ্গমঞ্চ তাঁর নাটক এড়িয়ে যেতে পারেনি। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে উনিশ শতকের ষাটের দশকে বাগবাজার এমেচার থিয়েটারের তরুণেরা নানান বাধ্যবাধকতায় বেছে নিয়েছিলেন দীনবন্ধুর নাটক। সখের থিয়েটার যখন সাধারণ রঙ্গালয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে, সেই সন্ধিক্ষণেও দেখি, ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন রজনীতে (১৮৭২-এর ৭ই ডিসেম্বর) মঞ্চস্থ নাটকটি হল দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'। তাঁর ব্যর্থতা একটা জায়গাতে—তা হল রোমান্স রসের নাটক রচনায়। কিন্তু জীবনের বাস্তবতা তথাকথিত নিম্নশ্রেণির নরনারী এবং অন্তঃপুরের নারীচরিত্র অঙ্গনে দীনবন্ধু সেইসময়ের প্রেক্ষিতে প্রতিস্পর্ধী স্রষ্টা।

একক ১৫ ❑ নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক

১৫.১ নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন

বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের কণ্ঠরোধ করার জন্য ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তৎকালীন ব্রিটিশ সরহকার চালু করে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন (Dramatic Performance Control Act) এই কালাকানুন চালু করার পেছনে শ্বেতাঙ্গ সরকারের কোনো তাৎক্ষণিক ভাবনা ছিল না; ছিল সুদূরপ্রসারী ভাবনা চিন্তা। এবং এই আইন চালু করার পেছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি রয়েছে বলে মনে করি।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজ শাসকের প্রতি শিক্ষিত বাঙালির একটা ইতিবাচক মনোভাব ছিল। রামমোহন বা অক্ষয়কুমার দত্তের মতো মানুষ ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলে মনে করতেন। কিন্তু এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ছবিটা বদলাতে শুরু করে। ইংরেজ শাসকের প্রতি নানা ঘটনা পরম্পরায় শিক্ষিত বাঙালির মোহভঙ্গ শুরু হয়। পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষার হাতে ধরে শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে জাগতে থাকে দেশাত্মবোধ ভাবনাচিন্তা— পরাধীনতার জন্য বেদনা। ১৮৬৭তে অনুষ্ঠিত হয় হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলা। বিভিন্ন ধরনের জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। সময়ের এই প্রেক্ষিতে আবার সখের থিয়েটার রূপান্তরিত হল সাধারণ রঙ্গালয়ে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম যে সাধারণ রঙ্গালয়টি গড়ে উঠল কলকাতায় তার নাম হল 'ন্যাশানাল থিয়েটার'। ১৮৭২ এর ৭ই ডিসেম্বর এই থিয়েটারের উদ্বোধন রজনীতে মঞ্চস্থ হল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। বলা যায় ব্রিট্রিশবিরোধী বা শাসকবিরোধী সুরের নাড়া বাঁধা হয়ে গেল, এর মধ্য দিয়ে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হল উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' ও 'শরৎ সরোজিনী'। ১৮৭৫ এর বরোদার ঘটনা নিয়ে 'হীরকচূর্ণ' নাটক লিখলেন অমৃতলাল বসু। দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় লিখলেন 'চা-কর দর্পণ'। এই নাটকটি অভিনীত না হলেও 'হীরকচূর্ণ' মঞ্চস্থ হয়। থিয়েটারের ক্ষমতা কতোটা, তা ভালই জানত শ্বেতাঙ্গ শাসক। তাই ভেতরে ভেতরে তারা প্রমাদ গুণল। নাটকও রঙ্গমঞ্চের কণ্ঠরোধ করার জন্য ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি চলতে লাগল।

তবে উপলক্ষ হিসেবে যে ঘটনার কথা না বললেই নয়, তা হল 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসনের অভিনয়। এই প্রহসনের যুবরাজ সাধারণ কেউ নন, একেবারে ইংলণ্ডের মহারাজা। ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স অফ ওয়েলস্। ইনি এসেছিলেন কলকাতায় এবং হঠাৎ করে তাঁর শখ হল বাঙালি অন্তঃপুরের মহিলাদের দেখলেন। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের পক্ষে মারাত্মক প্রস্তাব। কিন্তু যুবরাজের শখ পূরণে এগিয়ে এলেন ভবানীপুর নিবাসী হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর বাড়ির মেয়েরা যুবরাজকে উলু দিয়ে বরণ করলেন। সেদিনের কলকাতা এই ঘটনা নিয়ে তোলপাড়। ব্যঙ্গকবিতা লেখা হল। ঘটনাটিকে ব্যঙ্গ করে প্রহসন লিখলেন উপেন্দ্রনাথ দাস। প্রহসনের নাম 'গজদানন্দ ও যুবরাজ'। ১৮৭৬ এর ১৯শে ফেব্রুয়ারি 'সরোজিনী' নাটকে সঙ্গে এটি অভিনীত হল। রাজভট্ট সম্ভ্রান্ত প্রজাকে বিদ্রূপ করার অভিযোগে ঐ প্রহসনের

অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হল। প্রশাসনের চোখে ফাঁকি দিতে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃপক্ষ বিষয় একই রেখে প্রহসনের নাম পাল্টে করলেন 'হনুমান চরিত্র'। 'হনুমান চরিত্র'ও নিষিদ্ধ করল পুলিশ। তখন পুলিশের বড়ো কর্তাদের বিদ্রূপ করে লেখা হল 'দি পুলিশ অফ পীগ এ্যান্ড শীপ'। সুরেন্দ্রবিনোদিনীর সঙ্গে তা অভিনীতও হল ১৮৭৬এর ১লা মার্চ। ইতিমধ্যে লর্ড নর্থব্রুক জারি করেছেন এক অর্ডিন্যান্স। ৪ঠা মার্চ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'সত্তা কী কলঙ্কিনী' অভিনয়ের সময় পুলিশ রঙ্গমঞ্চ ঘিরে ফেলে এবং গ্রেপ্তার করে থিয়েটারের লোকজন ও মালিককে। কোনো পুলিশের অভিযোগ টিকল না, কিন্তু সরকার আইন প্রণয়নে এগিয়ে যেতে লাগল। নাট্যনিয়ন্ত্রণের জন্য বিল বা আইনের খসড়া প্রকাশিত হল। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এর বিরোধিতা করলেন। কিন্তু সমস্ত বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন চালু দ্ধরা হল ১৮৭৬এর ১৬ ডিসেম্বর।

আইনে বলা হল—

১। অশ্লীল, মানহানিকর, সমাজমন বিক্ষিপ্ত করতে পারে বা রাজদ্রোহমূলক বা প্ররোচনামূলক নাটকের অভিনয় চলবে না। এর অন্যথা হলে শাস্তি পাবেন নাট্যকার এবং নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত যেকোনো ব্যক্তি— এমনকি দর্শক পর্যন্ত।

২। নাটক অভিনয়ের আগে পাণ্ডুলিপি পুলিশের কাছে জমা দিতে হবে এবং অনুমতি পেলে অভিনয় করা যাবে।

এইভাবে ব্রিটিশ শাসক নাটক তথা থিয়েটারের প্রতিবাদী স্বর দমন করতে তৈরি হল কালাকানুন। পত্রপত্রিকায় এর বিরুদ্ধে সমালোচনা হলেও এই আইন বন্ধ হল না। সবমিলে বাংলা থিয়েটারের উপর এর ফল হল গভীর।

১। প্রত্যক্ষ ফল হল রঙ্গমঞ্চের শূন্যদশা। মামলা মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হলেন ভুবনমোহন নিয়োগী। উপেন্দ্রনাথ দাস বিলেতে চলে গেলেন। অমৃতলাল বসু গেলেন আন্দামানে। সুকুমারী দত্ত থিয়েটার ছেড়ে দিলেন আর অর্ধেন্দু দেশভ্রমণে বেড়িয়ে পড়লেন।

২। রঙ্গমঞ্চের শূন্যতা সাময়িকভাবে পূরণ করল পৌরাণিক নাটক। এই সূত্রেই রঙ্গমঞ্চে পদধূলি পড়ল সাধু-সন্ন্যাসীদের। রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠল তীর্থক্ষেত্র।

৩। রঙ্গমঞ্চে তথা নাট্যসাহিত্যে জীবন সংগ্রামের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল দেব আদর্শ।

৪। কিছু পরে রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল লঘু নাচগানের গীতিনাট্যের পসার। যার ফলে বাংলা নাটক তার বলিষ্ঠতা হারাল, হারাল তার স্বাভাবিক গতিপথ।

৫। আইনের কুফল এখানেই শেষ হল না। বহু নাটক এই আইন বলে নিষিদ্ধ করা হল। এই

তালিকায় রয়েছে গিরিশচন্দ্রের সিরাজদৌল্লা 'মীরকাশিম' 'ছত্রপতি শিবাজী', ক্ষীরোদাপ্রসাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' 'বাঙ্গালার মসনদ', 'নন্দকুমার', মন্মথ রায়ের 'কারাগার' এর মতো বহু নাটক। স্বাধীন ভারতেও বাংলা নাট্যের স্বাভাবিক গতিপথকে ব্যাহত করার জন্য বিভিন্ন শাসক বারবার এই আইনকে কাজে লাগিয়েছে।

১৫.২ গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক

১৮৭২তে বাংলা থিয়েটারের যে পর্বান্তর ঘটে, যাকে আমরা সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগ বলে চিহ্নিত করে থাকি, সেই যুগের একজন প্রধান নাট্যকার হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তবে বাহ্যত তিনি নাট্যকার হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর আসল পরিচয় ছিল ভিন্ন; নিছকই পরিস্থিতির পাকেচক্রে তিনি হয়ে উঠলেন বা হয়ে উঠতে বাধ্যতে হলেন নাট্যকার।

গিরিশচন্দ্র আসলে হতে চেয়েছিলেন কবি। কবিতা লেখার পাশাপাশি লিখতেন গানও। সেইসূত্রে জুড়ে পড়লেন বাগবাজারের সখের নাট্যদলের সঙ্গে। প্রথাগত শিক্ষা অসমাপ্ত, বাল্যবয়সে বিবাহ অথচ কর্মহীন বেকারজীবন—মজে গেলেন সখের থিয়েটারে। 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ চরিত্রে প্রশংসিত অভিনয় করলেন। করলেন অভিনয় শিক্ষাদানেরও কাজ। গিরিশের শিল্পীসত্তা পেল স্বতস্ফূর্তি। বাগবাজার এমেচার থিয়েটার বা শ্যামবাজার নাট্যসমাজ থেকে যখন গড়ে উঠছে ন্যাশনাল থিয়েটার, সেই সূচনালগ্নে গিরিশ যুক্ত ছিলেন না নিজের তাত্ত্বিক অবস্থানের কারণে। অবশ্য কিছু পরেই গিরিশ যুক্ত হয়ে গেলেন সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে। আসলে গিরিশ ছাড়া সাধারণ রঙ্গালয় কিংবা সাধারণ রঙ্গালয় ছাড়া গিরিশ ভাবা যায় না। নট, নাট্যশিক্ষক, নাট্যসংগঠক রঙ্গমঞ্চে। মালিক বা ম্যানেজার কোন দায়িত্ব পালন করেননি গিরিশ? দেড়শো টাকার চাকরি ছেড়ে একশো টাকার মাইনেতে হয়ে গেলেন থিয়েটারের হোলটাইমার। থিয়েটারের দায়বদ্ধকর্মী গিরিশ যখন দেখলেন অভিনয়যোগ্য নাটক পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তিনি নেমে পড়লেন নাট্যরচনা করতে। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ঐতিহাসিক সঙ্গতভাবে জানান:

> রঙ্গমঞ্চের শূন্য উদর পূর্ণ করতে নাটক রচনায় হাত দিতে গিয়ে বেতনভোগী গিরিশ পেশাদারি মঞ্চের 'প্লে-রাইট' হয়ে পড়লেন। ['বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস' : দর্শন চৌধুরী]

গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৭৭তে— দুটি গীতিনাট্য— 'আগমনী' ও 'অকালবোধন'। এর আগে অবস্য গিরিশচন্দ্র জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাস ও আখ্যান কাব্যের নাট্যরূপ দিতে শুরু করেন। আর তাঁর শেষ নাট্য রচনা ১৯১২তে। সবমিলিয়ে প্রায় ৯১টির মতো নাটক তিনি লেখেন। এর মধ্যে ৮০টি হল তাঁর নিজস্ব রচনা আর বাকিগুলি হল বিভিন্ন উপন্যাস ও কাব্যের নাট্যরূপ।

গিরিশচন্দ্রের সমগ্র নাট্যজীবনকে পাঁচটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

১। প্রথম পর্ব (১৮৭৩-১৮৮১) : এটা হল গিরিশচন্দ্রের নিজেকে প্রস্তুত করার কাল। এই পর্বে তিনি যেমন

বিভিন্ন গল্প উপন্যাস কাব্যের নাট্যরূপ দিয়েছেন, তেমনি কিছু গীতিনাট্যও রচনা করেছেন। গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমের সাতখানি উপন্যাসকে নাট্যরূপ দেন। উপন্যাসগুলি হল— দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল এবং সীতারাম। এছাড়া মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য', নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' দীনবন্ধুর 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ'কে তিনি নাট্যরূপ দেন। এই পর্বে প্রকাশিত গীতিনাট্যের সংখ্যা প্রায় সাত। তার মধ্যে 'আগমনী', 'আকাশবোধনে'র কথা আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে 'দোললীলা' বা 'মোহিনী প্রতিমা'র মতো রচনা। এই পর্বের রচনাগুলি একেবারেই বৈশিষ্ট্যহীন।

২। দ্বিতীয় পর্ব (১৮৮১-১৮৮৪) : এটি হল গিরিশচন্দ্রের নাট্যজীবনের শ্রেষ্ঠপর্ব। রাজকৃষ্ণ রায়কে অনুসরণ করে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং অচিরেই সাফল্য পান। নাটকগুলি সমকালে চরমভাবে জনপ্রিয় হল। এই ধারার কয়েকটি নাটক হল— 'রাবণবধ', 'সীতার বনবাস', 'দক্ষযজ্ঞ', 'নলদময়ন্তী', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' ইত্যাদি। এই ধারার নাটকগুলির মূল বিষয় হল— আদর্শবাদ, ভক্তিরস ও নীতিবাদ। নাটকের আঙ্গিকে তিনি ব্যবহার করলেন ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ তথা গৈরিশ ছন্দ। এই ছন্দের প্রথম ব্যবহার দেখি 'রাবণবধ' নাটকে। এই গৈরিশ ছন্দের ব্যবহারে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক এক বিশেষ গাম্ভীর্য অর্জন করে।

৩। তৃতীয় পর্ব (১৮৮৪-১৮৮৯) : এই পর্বে গিরিশচন্দ্র মূলত অবতার মহাপুরুষের জীবনীকে আশ্রয় করে নাটক রচনা করেন। এই নাটকগুলিকে ব্যাপক অর্থে পৌরাণিক নাট্যধারারই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই ধারার কয়েকটি নাটক হল 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৪), 'নিমাইসন্ন্যাস', 'বুদ্ধদেব চরিত', 'রূপসনাতন' ইত্যাদি। বক্তব্য বিষয়ের দিক থেকে পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে এই নাটকগুলির তেমন কোনো পার্থক্য নেই। এই পর্বে কয়েকখানি গীতিনাট্য ও প্রহসন রচনা করেন গিরিশচন্দ্র। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয় গীতিনাট্য হল 'আবু হোসেন' (১৮৯৩)। অন্যান্য রচনা বা প্রহসনগুলি হল 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'বেল্লিকবাজার', 'বড়দিনের বখশিশ' ইত্যাদি। তবে প্রহসন রচনায় গিরিশচন্দ্রকে সফল বলাযায় না।

৪। চতুর্থ পর্ব (১৮৮৯-১৯০৫) : গিরিশচন্দ্রের নাট্যজীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়। এই পর্বে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হল সামাজিক নাটক। যেমন— 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯) 'মায়াবসান' (১৮৮৯), 'বলিদান' (১৯০৫)। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাট্যকার জীবনে মোট চারটি সামাজিক নাটক লিখেছিলেন। চতুর্থ সামাজিক নাটকটি এর পরের পর্বে প্রকাশিত। গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক হল 'প্রফুল্ল'। সাধারণ চোখে নাটকটির বিষয় বলা যেতে পারে— যৌথ পরিবারে ভাঙন। বড়োভাই যোগেশ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মা-দুইভাই-স্ত্রী-পুত্র নিয়ে গড়া যৌথ পরিবারটিকে দাঁড় করান। কুচক্রী মেজভাইয়ের জন্য সুখের মুখ দেখা সংসারটি ছারখার হয়ে যায়। এই নাটকের বিয়োগান্তক হাহাকার— 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' সেদিন খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। 'বলিদান' পণপ্রথার বিরুদ্ধে লেখা নাটক। দায়বদ্ধ রচনা, কিন্তু শিল্পগুণের দিক থেকে ততোটা উল্লেখযোগ্য বলা যায় না। 'মায়াবসান' রচনামূল্যে আরও নগণ্য। 'শাস্তি কি শান্তি'

বিধবা সমস্যা নিয়ে রচিত। গিরিশচন্দ্র এখানে সমাজসংস্কারক নন, বরং বঙ্কিমের মতো রক্ষণশীল সমাজের ধ্বজাধারী হয়ে উঠেছেন। বলা বাহুল্য রসমূল্যে এটিও উত্তীর্ণ রচনা নয়।

৫। পঞ্চম পর্ব (১৯০৫-১৯১২) : বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গিরিশচন্দ্র তাঁর নাট্যজীবনের শেষপর্বে রচনা করেন ঐতিহাসিক তথা দেশাত্মবোধক নাটক। এই ধারার উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল 'সিরাজদৌল্লা (১৯০৬), 'মীরকাশিম' (১৯০৬), 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭), 'অশোক' (১৯১১) ইত্যাদি। এর মধ্যে 'সিরাজদৌল্লা'ই গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকের করিমচাচা চরিত্রটি খুবই উপভোগ্য। তবে পৌরাণিক নাটকের মতো সাফল্য তিনি এই ধারায় পাননি।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার কতকগুলি প্রবণতা আমরা চিহ্নিত করতে পারি। প্রথমেই বলা যায় যে বৈশিষ্ট্যের কথা, তা হল— ভক্তিভাবও পৌরাণিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য। বলা বাহুল্য এর পেছনে সেই সময়ের অবদান অস্বীকার করা যায় না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দুত্বের হাত ধরেই ঘটে জাতীয়চেতনার উদ্বোধন। ক্রমশ সেই হিন্দুত্ববাদী চিন্তাচেতনার প্রসার ঘটতে থাকে। তার একটা বড়ো প্রমাণ হল— একসময়ের জড়বাদী বঙ্কিম ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিকায় বিশ্বাসী। বঙ্কিমের অনুগামী চন্দ্রনাথ বসু অক্ষয়চন্দ্র সরকাররা পৌত্তলিকতা ও গুরুবাদী চিন্তাভাবনার চর্চা করছেন। কলকাতায় গড়ে উঠছে 'থিওসফিক্যাল সোসাইটি'। এককালের ডিরোজিয়ান প্যারীচাঁদ মিত্র প্রেতচর্চা করছেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে যাচ্ছে। কেশবচন্দ্র ঝুঁকে পড়ছেন হিন্দুধর্মের দিকে। দক্ষিণেশ্বরে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এই রামকৃষ্ণের পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন গিরিশচন্দ্র। তখন তাঁর মনে হচ্ছে:

> হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। ধর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।

এই ভাবনা থেকেই গিরিশচন্দ্রের সমস্ত শ্রেণির নাটকে উপদেশ বা নীতিকথা কোনো-না-কোনোভাবে এসেই যায়। এটাকেই অন্যভাবে বলা যায় নাটকের মাধ্যমে লোকশিক্ষা দেওয়া। গিরিশচন্দ্রের নাটকে এটা আছে—অস্বীকার করা যাবে না। এর পেছনে রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা মনে করি ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবের পাশাপাশি সময়ের প্রভাবই মুখ্য। এই একইসূত্রে গিরিশচন্দ্রের নাটকের গঠনে একদা ছাঁচ বা ছক লক্ষ করা যায়। আমরা দেখি, নাটকের ভূমিকাতেই নাটকের পরিণতির একদা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আসলে উদ্দেশ্যমূলক বা বিশেষ বক্তব্যপ্রধান নাটকে এটা হয়েই থাকে। পাশাপাশি গিরিশচন্দ্রের নাটকে দেখা যায় এক বা একের বেশি মহাপুরুষ চরিত্রের উপস্থিতি। এইসব চরিত্র মূল নাট্যকাহিনিতে অসম্পৃক্ত থেকেও নাটককে অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

এক শ্রেণির সমালোচকদের মতে, গিরিশচন্দ্রের নাটক নাকি শিল্পমূল্য শূন্য। কারণ তিনি দর্শক তথা রঙ্গমঞ্চের চাহিদামতো নাটক লিখেছেন। গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের দর্শকের চাহিদামতো নাটক লিখেছেন বা লিখতে বাধ্য হয়েছেন— এটা আমরা মানি। কিন্তু এর জন্যই তাঁর নাটকের শিল্পমূল্য নেই— এটা আমরা মানি না। যে প্রতিকূল পরিবেশে তাঁকে নাট্যচর্চা করতে হয়েছে বা তার অঙ্গহিসেবে নাটক লিখতে হয়েছে,

আমরা শুধু সেই প্রেক্ষিতটিকে মনে রাখতে বলব। ১৮৭৬তে জারি হয়েছে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন। আইনের চোখরাঙানি থেকে বাঁচতে থিয়েটার তখন জুতসই মোড়ক খুঁজছে। ভয় শুধু বিদেশি শাসককে নয়; এদেশের ধনী-শাসক-অনুগত মানুষগুলিও থিয়েটারের প্রতি...। কারণ তাদের চরিত্রের মুখোশ তাদের ঘরের কথা হাটে জানিয়ে দিচ্ছে থিয়েটার। অথচ তাদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা তখনকার থিয়েটার এক পাও চলতে পারে না। এক অদ্ভুত সমতাবিধানের খেলা খেলতে হয়েছে তখনকার থিয়েটার, নাটক তথা নাট্যকারকে। এই খেলাটা সবচেয়ে বেশি খেলতে হয়েছে গিরিশচন্দ্রকে। এরপরও আমরা দেখি, বাংলা নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের অবদান কম নয়। সূত্রাকারে যদি বলি, তবে তা হবে এইরকম:

১। তিনিই প্রথম নাট্যকার যাঁর সব নাটকই অভিনয়ের সৌভাগ্য লাভ করেছে। এ এক বিরল সৌভাগ্য!

২। গিরিশচন্দ্রই আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নাটক লিখেছেন। তাঁর সবকটি নাটক উৎকৃষ্ট নয় ঠিকই, কিন্তু তাঁর বেশ কিছু নাটক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

৩। গিরিশচন্দ্রের আগে এবং পরে পৌরাণিক নাটক অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

৪। অবতার মহাপুরুষদের জীবন নিয়ে তিনিই প্রথম নাটক লেখেন। বাংলা নাট্যসাহিত্য পায় একটি নতুন নাট্যধারা— 'অবতার-মহাপুরুষের জীবনীমূলক নাটক। এবং এই ধারাকে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের স্বরে উন্নীত করেন।

৫। ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রেও গিরিশচন্দ্র একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠশিল্পী। বলাবাহুল্য যুগের দাবি মেনে এক্ষেত্রে তিনি ইতিহাসের চেয়ে জাতীয় আবেগের প্রতি অধিক দায়বদ্ধ।

৬। গিরিশচন্দ্র একসময় বলেছিলেন, সামাজিক নাটক লেখা আর নর্মদার পাঁকঘাটা এক জিনিস। এই গিরিশচন্দ্রই মঞ্চের চাহিদায় যুগের দাবিতে রচনা করেন 'প্রফুল্ল', 'বলিদান'-এর মতো সামাজিক নাটক। এক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র ঘোর বাস্তববাদী—সমকাল সমাজের ছবি তুলে ধরতে নির্মম বস্তুনিষ্ঠা দেখিয়েছেন। বাংলা সামাজিক নাটকের ধারায় গিরিশচন্দ্রকে অস্বীকার করা যায়না।

৭। নাটকের ভাষা নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এক নতুন ভাষারীতি সৃষ্টি করেন। যাকে আমরা বলি গৈরিশছন্দ। অবশ্য গিরিশচন্দ্রের আগে রাজকৃষ্ণ রায় বা আরও কেউ কেউ এই ধরনের ছন্দ নাটকে ব্যবহার করেছিলেন।

পরিশেষে, গৈরিশ-প্রতিভার মূল্যায়নে, একথাই বলা যায়, পৌরাণিক নাট্যধারাতেই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান নিহিত। অনেকের মতে, গিরিশচন্দ্র বাংলা নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। এটা একধরনের অতিশয়োক্তি। শ্রেষ্ঠ শিল্পী না হলেও তিনি যে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, সে বিষয়ে সংশয় নেই। তাই বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে গিরিশচন্দ্রের অবদান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

একক ১৬ ❑ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস থেকে এ পর্যন্ত আমরা জেনেছি, পাশ্চাত্য নাটক ও থিয়েটারের বাহ্যিক প্রেরণায় বাংলা নাটক পথচলা শুরু করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। পাশ্চাত্য নাট্যরীতি প্রয়োগের কথা বললেন এবং তাঁর মতো করে চেষ্টাও করলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখলাম, তিনি যতোটা বললেন, ততোটা করে দেখাতে পারলেন। মধুসূদন সমসাময়িক দীনবন্ধু নাট্যরীতি নিয়ে কোনো বড়ো সংস্কারের কথা বললেন না, তবে তিনি নীরবে যেটা করলেন, সেটা হল প্রতিবাদ বা শাসকবিরোধিতাকে নাটকের সঙ্গে বলিষ্ঠভাবে যুক্ত করে দিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এক কঠিন সময়ে নাট্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন। জারি হয়েছে নাট্যনিয়ন্ত্রণের কালাকানুন। সাধারণ রঙ্গালয় ব্যবসায়ীদের কব্জায়। সবকিছু মিলে এক মধ্যস্থা বা আপসের রাস্তা নিলেন তিনি। সমকালীন সাধারণ বাঙালি দর্শকের চাহিদামতো নাটক লিখতে বাধ্য হলেন বলা যায়। গিরিশচন্দ্রের নাটকের প্রকরণে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির ছাপ, কিন্তু নাট্যভাবনায় দেখি প্রাচ্য জীবনদর্শনের প্রভাব। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, জীবনভাবনায় ও শিল্পপ্রকরণে এক পূর্ণাঙ্গ আধুনিক নাট্যবোধ পাই না প্রাক্-দ্বিজেন্দ্র বাংলা নাট্যসাহিত্যে। নানা ত্রুটিবিচ্যুতি বা সীমাবদ্ধতার চিহ্ন সেখানে বারে বারে চোখে পড়ে। বলা যায়, পাশ্চাত্যানুসারী বাংলা নাটকের এই 'জন্মদোষ'কে যিনি আপন সামর্থ্যে মুক্ত করলেন, তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)।

দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মেছিলেন সেকালের বঙ্গসংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র একদিকে ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান আর অন্যদিকে ছিলেন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ তথা সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি। এই পরিবারের সন্তান হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন মেধাবী ছাত্র ও সাহিত্যেও সংগীতানুরাগী। প্রেসিডেন্সি থেকে ইংরেজিতে এম.এ. করে বিলেত গেলেন কৃষিবিদ্যায় উচ্চ ডিগ্রি নিতে। এখানেই অর্জন করলেন পাশ্চাত্য সংগীত ও নাটক সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান। বিলেত যাওয়ার জন্য সমাজচ্যুত হতে হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল মাথা পেতে নেননি; প্রতিবাদ করেছিলেন। লিখলেন 'এরাঘরে' নামক প্রহসনধর্মী রচনা। এর আগে অবশ্য বহু কবিতা লিখে ফেলেছেন। সিরিয়াস অনুভূতিপ্রবণ নাটক রচনায় হাত দিলেন তখন, যখন প্রিয় সহধর্মিনীকে অকালে হারালেন। দেশে তখন বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদের ভাবোন্মাদনা এই ভাবধারায় স্নাত হলেন তিনি, কিন্তু তাঁর শিল্পীসত্তা তাতে উন্মাদ হল না; বরং পরিশীলিত মন ও মনন থেকে লিখতে লাগলেন একের পর এক নাটক।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম যে ধারার নাটক রচনা করেন, তা হল প্রহসনমূলক। এই ধারাতে বিভিন্ন সময় একাধিক নাটক তিনি রচনা করেছেন। এই ধারার প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা 'কলির অবতার' (১৮৯৫)। এতে রয়েছে বিলেতফেরত, ব্রাহ্ম, নব্যহিন্দু, গোঁড়া এবং পণ্ডিত— এই পাঁচ সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রূপ আছে। শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্যমূলক রচনা। 'বিরহ' প্রহসনে ঘটনা সংস্থানের মধ্য দিয়ে হাস্যরসের উৎসার ঘটেছে।

এই গানগুলি বেশ ভালো। 'ত্র্যহস্পর্শ' নিম্নস্তরের ভাঁড়ামিতে পূর্ণ। 'প্রায়শ্চিত্ত'কেও উল্লেখযোগ্য রচনা বলা চলে না। 'পুনর্জন্ম'ও তাই। 'আনন্দবিদায়' (১৯১২) এই ধারার শুধু নয়, দ্বিজেন্দ্র নাট্যধারার বিতর্কিত রচনা। দ্বিজেন্দ্র-রবীন্দ্র বিরোধে যে হলাহল উঠেছিল তার ফসল এই রচনা। অনেকের মতে, দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার 'কলঙ্কস্বরূপ' এই 'আনন্দবিদায়'।

বাংলা পৌরাণিক নাটকের ধারায় দ্বিজেন্দ্রলাল কিছুটা অন্যভাবে হলেও নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। 'পাষাণী' (১৯০০) দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটক। রামায়ণের অহল্যা কাহিনির নতুন ভাষা রচনা করেছেন তিনি। পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে একেবারে রক্তমাংসের সাধারণ মানুষের মতো আঁকা হয়েছে। নারীজাতির প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রদ্ধা এখানে চোখে পড়ার মতো। 'সীতা' (১৯০৮)তেও এই ভাবনার প্রতিফলন রয়েছে। রামায়ণ ও ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' অনুসরণ লেখা হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের নিজস্বতা বেশ বোঝা যায়। সীতা চরিত্রের উজ্জ্বল্যের পাশাপাশি রামচরিতের ট্রাজিকধর্মিতা, এই নাটকের উল্লেখযোগ্য বিষয়। 'ভীষ্ম' (১৯১৪) নাটকের ভাব ও ভাষার চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হই আমরা। নাটকের নামচরিত্রটি উজ্জ্বল নিঃসন্দেহে। তবে প্রধান নারীচরিত্রদুটি—অম্বা ও সত্যবতী ততোটা আলো পায়নি।

সমকালীন বিষয় নিয়ে নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল ততোটা সফল নন, তা আমরা তাঁর প্রহসনধর্মী রচনাগুলি দেখলেই বুঝতে পারি। দুটি সামাজিক নাটক দ্বিজেন্দ্র-নাট্য তালিকায় রয়েছে। যথা— 'পরপারে' (১৯১২) এবং 'বঙ্গনারী' (১৯১৬)। অগ্রগামী দ্বিজেন্দ্রলালকে নাটকগুলিতে পাওয়া যায় না।

বলাবাহুল্য ঐতিহাসিক নাটক রচনাতেই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক হল 'তারাবাঈ' (১৯০৩)। যেহেতু এটি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক, তাই এর মধ্যে ঐতিহাসিক নাটকের সাফল্যের রসায়ন ততোটা আবিষ্কৃত হতে দেখি না। বরং দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনধর্মী রচনার কিছু রেশ এতে দেখা যায়। কর্নেল জেমস্ টডের রাজস্থান বৃত্তান্তকে অবলম্বন করে এই নাটক লেখা। পৃথ্বীরাজের কাহিনি এতে গৌণ হয়ে গেছে। চরিত্রের মধ্যে উজ্জ্বল বলা যায় সূর্যমল ও তার স্ত্রী তমসাকে। চরিত্রদুটিতে শেক্সপিয়রের প্রভাব বোঝা যায়। অমিত্রাক্ষর ছন্দ এতে ব্যবহার করলেও তার ধ্বনিগৌরব রক্ষা করতে পারেননি।

'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) থেকে শুধু দ্বিজেন্দ্রলালের নয়, বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটকের যুগ শুরু হয় বলা যায়। এই নাটকে কিংবদন্তী স্বাধীনতাসংগ্রামী প্রতাপের অতুলনীয় বীরত্ব, অনুপম দেশপ্রেম এবং মহৎ ত্যাগের চিত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। রাজা হয়েও তিনি দীনের থেকে দীন। বংশগৌরব রক্ষার চেষ্টায় তিনি বহু শ্রেষ্ঠ রাজপুত বীরের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। নিজের ভাই শক্ত সিংহকে পেয়েও ছেড়েছেন। অন্যায়ের শাস্তি দিতে গিয়ে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত হারিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের পটভূমিতে দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রতাপসিংহ' চরম অভিনন্দিত হল। দোষ দুর্বলতার অতীত আদর্শ চরিত অঙ্কনের প্রচেষ্টার ফল 'দুর্গাদাস' (১৯০৬)। নাটক হিসেবে ততোটা উত্তীর্ণ নয়। তবে নাটকের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র গুলনেয়ার। হিন্দু মুসলমান ঐক্যের দিকটি তুলে ধরেছে নাটকের দিলীর খাঁ ও

কাশিম চরিত্র। এর পরেই রয়েছে দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক 'নূরজাহান' (১৯০৮)। মোঘল ইতিহাসের বিতর্কিত নারীচরিত্রকে নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক ট্রাজেডি রচনা করলেন। নায়িকা এখানে পরিপূর্ণভাবে ট্রাজেডি শিরোপার অধিকারী, তার দ্বিতীয় কোনো দাবিদার নেই। এই নাটকে বাইরের যুদ্ধ-বিগ্রহের তুলনায় নূরজাহান চরিত্রের ভেতরের দ্বন্দ্ব অতুলনীয় শিল্পরূপ লাভ করেছে। সামান্য রাজকর্মচারীর কন্যা হয়ে শুধুমাত্র রূপ ও উচ্চাশার জোরে হয়ে ওঠে ভারতসম্রাজ্ঞী। কিন্তু প্রবৃত্তির খেলায় যে শেষ পর্যন্ত হেরে যায়। তাঁর ট্রাজেডি শেক্সপিয়রের একাধিক খ্যাতিনামা ট্রাজেডির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। গানও এই নাটকের পরমসম্পদ। 'মেবার পতন' (১৯০৮) উদ্দেশ্যমূলক নাটক; তবে তা কোনো সংকীর্ণ উদ্দেশ্য নয়। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন:

> এই নাটকে আমি এক মহানীতি লইয়া বসিয়াছি; সে নীতি বিশ্বপ্রেম।

এই নাটকে ব্যক্তিপ্রেম ছাপিয়ে দেশপ্রেম এবং দেশপ্রেম ছাপিয়ে বিশ্বপ্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে। সেই জয় পেয়েছে নাট্যকারের মানসী। তার গানের ধ্রুবপদ হল: "গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ।" নাটক হিসেবে ত্রুটিবিচ্যুতির কথা অস্বীকার করা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বভাবসিদ্ধভঙ্গিতে সংগীত প্রয়োগ করেছেন। ঐতিহাসিক নাটকের 'প্রত্যাশিত' আবহ নির্মাণ করেছেন। কিন্তু নাট্যমূল্যে উতরোয় না। সেই তুলনায় 'সাজাহান' (১৯০৯) উচ্চাঙ্গের নাট্যসৃষ্টি। সমালোচক অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন:

> "নাটকের মধ্যে বহুতর চরিত্র এবং বিভিন্ন উপকাহিনি থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার সুনিপুণ শিল্পকৌশলে সব ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে অবিচ্ছিন্নভাবে পরস্পরের সহিত গাঁথিয়া দিয়াছেন।"

'ট্রাজিক-শিরোপা সাজাহান গেলেও নাটকের নায়কত্ব বিষয়ে নিরঙ্কুশ দাবি জানাতে পারেন না তিনি। এক্ষেত্রে তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর পুত্র ঔরংজীব। সাজাহান, দারা, সুজা, মোরাদ, সোলেমান, মহম্মদ— সকলের করুণ পরিণতির জন্য দায়ী একমাত্র ঔরংজীব। সে ক্রূরকুটিল কিন্তু হৃদয়হীন নয়। জাহানারা উজ্জ্বল নারী চরিত্র— অসহায় বন্দী পিতার একমাত্র সান্ত্বনা। এই নাটকের উপসংহার নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সমালোচকের মতে, এই নাটকশেষে পিতাপুত্রের যে মিলন— তা আসলে শর্করামণ্ডিত কুইনাইনের মতো, বেদনার বটিকায় শর্করার প্রলেপমাত্র। এই নাটকেই রয়েছে দ্বিজেন্দ্রলালের সেই বিখ্যাত গান— 'ধনধান্য পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা"। শেক্সপীয়রের 'সিনিয়র' নাটকের প্রভাবও কিছুটা অনুভূত হয় এই নাটকে।

হিন্দুপুরাণ, কিংবদন্তী ও গ্রিক ইতিহাস অবলম্বনে দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করেন 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১)। চাণক্যের কূটচক্রান্তে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনে আসীন হওয়া, এই নাটকের মূল ঘটনা। তবে চন্দ্রগুপ্ত নয়, নাটকের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে চাণক্য। চাণক্যের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সমস্ত কাহিনিকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তার পাশে চন্দ্রগুপ্ত নিতান্ত নিষ্প্রভ। গটনশৈলীতে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও সমকালে নাটকটি জনপ্রিয় হয় এবং মঞ্চ আনুকূল্য পায়। এরপরেও একটি ইতিহাসাশ্রিত নাটক রচনা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল।

রচয়িতার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত এই নাটকটি হল 'সিংহল বিজয়' (১৯১৫)। এর বিষয় হল— বাঙালি বীর বিজয়সিংহের লঙ্কা জয়। তবে বিজয়সিংহের বাঙালি পরিচয়টা বিতর্কিত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে তিনি গুজরাটী। নাটকটিতে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার ছাপ নেই বললেই চলে। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের তালিকাটি কেউ কেউ 'ঘোড়ার রুস্তম'এর নাম করে থাকেন। কিন্তু নাট্যকারের কথা থেকেই জানা যায়, এটি ঠিক অপেরা বা ঠিক নাটকও নয়, এটি একটি মিশ্র রচনা।

দ্বিজেন্দ্রলালের আগে বা সমকালে ঐতিহাসিক নাটক অনেকেই লিখেছেন। যেমন— মধুসূদন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ, কিন্তু ইতিহাসের ঘটনা বা আখ্যান বা চরিত্র নিয়ে নাটক লিখলেই তা ঐতিহাসিক নাটক হয়ে যায় না, এটা দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বসূরীরা জানতেন না বা সচেতনমনে বিষয়টি অনুধাবনে, চেষ্টা করেননি। ঐতিহাসিকের নাটকের মূল ব্যাপারটি হল ইতিহাসের সঙ্গে সৃজনশীল কল্পনার মেলবন্ধন ঘটানো। কাজটি বড়ো সহজ নয়। প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে যেমন অস্বীকার করা যাবে না; একইসঙ্গে কল্পনার লাগামও ছেড়ে দেওয়া যাবে না কোনো অজুহাতে বা কোনো ছোটো-বড়ো উদ্দেশ্যপূরণের তাগিদে। এই কঠিন ভারসাম্যের খেলায় উত্তীর্ণ দ্বিজেন্দ্রলাল। বড়োরকমের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অতিক্রম করে প্রথম যথাযথ ঐতিহাসিক নাটক রচনার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে দ্বিজেন্দ্রলালের। সমালোচক দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন:

> দ্বিজেন্দ্রলালই ইতিহাস ও কল্পনার পরিমাণ সামঞ্জস্যে, অন্তর্দ্বন্দ্বময় চরিত্রসৃষ্টিতে, ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল রচনায়, সংলাপ ও ভাষা প্রয়োগে এবং সর্বোপরি একটি বিশেষ পরিকল্পনার অধীনতায় ঐতিহাসিক নাটক কীভাবে সার্থকতা লাভ করে, ধীরে ধীরে সে কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন।

সফল ঐতিহাসিক নাটক রচনার পাশাপাশি এরই হাত ধরে দ্বিজেন্দ্রলাল আরও একটি সাফল্য বাংলা নাট্যসাহিত্যে এনে দিয়েছিলেন, তা হল, বাংলায় উচ্চাঙ্গের ট্রাজেডি রচনা। তাঁর আগে অনেকেই জেনে বা না জেনে ট্রাজেডিধর্মী নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু ট্রাজেডির শিল্পরূপের নিহিতসূত্র তাঁরা ধরতে পারেননি। তার ফলে তাঁদের হাতে ট্রাজেডির নামে লেখা হচ্ছিল বিয়োগান্তক নাটক। দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান' বাংলা নাট্যসাহিত্যে ট্রাজেডি নাটকের উজ্জ্বল উদাহরণ। চরিত্রচিত্রণেও দ্বিজেন্দ্রলালের সাফল্য রীতিমতো ঈর্ষণীয়। তাঁর নাটক যেন চরিত্রের চিত্রশালা। জাহানারা, লয়লা, দিলদার কিংবা পিয়ারা বা সীতা—এরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। ঐতিহাসিক নাটককে যেমন তিনি স্বদেশপ্রেমের বদ্ধ কারাগার থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তেমনটাই পৌরাণিক নাটককে ভক্তিভাবের বন্যা থেকে বাঁচিয়েছিলেন। কী পৌরাণিক নাটক, কী ঐতিহাসিক নাটক— মনুষ্যত্বের আদর্শকে কখনো ছোটো করেননি। অন্ধ স্বদেশপ্রেমের চেয়ে বিশ্বপ্রেম, কত বড়ো তা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। নাটকের সংলাপের টেকনিক্যাল সমস্যা নিয়ে প্রথম তিনি ভেবেছেন— স্বগতোক্তির ধরন বদলে ফেলেছেন। সংলাপের মধ্যে এনেছেন গদ্যের কাঠিন্য ও কবিতার কোমলতার সংমিশ্রণ। আর গান যেখানে আগের বাংলা নাটকে ছিল নিছক ট্রাজিক রিলিফ', সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল গানকে করলেন নাটকের অন্তরঙ্গ উপাদান। সব মিলিয়ে নিছক পাশ্চাত্যানুসরণ নয়, তার গঠনমূলক প্রেরণাকে সামনে দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাটককে একটা আদর্শায়িত মান দান করলেন: যে নাটক শুধু মঞ্চমুখাপেক্ষী নয়, পাঠের মাধ্যমেও আস্বাদন করা যায় তার নাটকত্ব।

একক ১৭ ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক

আমরা বলতেই পারি, আধুনিক বাংলা নাটকের যথাযথ সূচনা মধুসূদনের হাতে। আসলে মধুসূদন খুব সচেতনভাবে পাশ্চাত্য নাটকের টেকনিক বাংলা নাটকে প্রয়োগ করেন বা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন বলা যায়। মধুসূদনের পরে পরে যাঁরা নাট্যচর্চা করতে এলেন, দেখি তাঁদের নাট্যরীতিতে প্রাচ্য নাট্যকলা ও পাশ্চাত্য নাট্যকলার দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান। পাশাপাশি লক্ষ করি, এই সময়ের নাটক যুগের চাহিদাকে একরকম মান্যতা দিয়েছে বলা যায়। অর্থাৎ এ পর্যন্ত বাংলা নাটকের যে ধারা, তা কোনো-না-কোনোভাবে যুগের ফসল। রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটককে ঠিক এভাবে দেখতে চাইলেন না। তিনি চাইলেন রূপে-স্বরূপে যথার্থ বাংলা নাটক—বাঙালির নাটক— নিছক বিনোদন নয়, বক্তব্যসর্বস্ব নয় অথচ পরিশীলিত, পরিমার্জিত, মননশীল এক উচ্চাঙ্গের শিল্পরূপ।

কবিতার মতোই নাটকেরও সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের সূচনা বালক বয়সে। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন প্রথম নাট্যধর্মী রচনা 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়'। গৃহশিক্ষকের কাছে নিয়েছেন ম্যাকবেথ পাঠ। করেছেন 'ম্যাকবেথ'-এর বাংলা অনুবাদ। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' বা 'চিতোর আক্রমণ নাটক' (১৮৭৫)তে লেখেন, 'জ্বল জ্বল চিতা! দ্বিগুণ! দ্বিগুণ!' গানটি। আসলে বাড়িতে তাঁর জন্মের পাঁচ বছরে গড়ে ওঠে 'জোড়াসাঁকো থিয়েটার' (১৮৬৬)। বাড়ির ছেলে-মেয়ে সকলেই তাতে কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত। এই আবহে খুব স্বাভাবিকভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু' প্রহসনে অলীকবাবু চরিত্রে অভিনয় করেন ষোল বছরের রবীন্দ্রনাথ। একের পর এক নাটক লিখতে থাকেন— 'বাল্মীকি' প্রতিভা 'রুদ্রচণ্ড'। আমৃত্যু তিনি নাট্যচর্চায় যুক্ত থেকেছেন। নাটক লেখালেখি করেছেন ৬০ বছরের কাছাকাছি সময়। আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করে রবীন্দ্রনাটকের সাধারণ পরিচয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

(ক) গীতিনাট্য : এই ধারায় আমরা পেয়েছি 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১), 'কালমৃগয়া' এবং 'মায়ার খেলা'। এর মধ্যে গীতিনাট্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য রচনা 'বাল্মীকি প্রতিভা'। এর সংগীত অনন্য সম্পদ। 'মায়ার খেলা'তে নাটক কম, গানই বেশি। আর আছে প্রেম সম্পর্কে তত্ত্বানুভূতি। 'কালমৃগয়া'র বিষয় দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ। তিনটি গীতিনাট্যের মধ্যে 'বাল্মীকি প্রতিভা' রবীন্দ্রনাথের নিজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এর মূল বিষয় হল বাল্মীকি চরিত্রের উত্তরণ।

(খ) কাব্যনাট্য : এই পর্যায়ে আমরা রাখতে পারি, 'রুদ্রচণ্ড', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'রাজা ও রানী (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২) এবং 'মালিনী' (১৮৯৬)কে। 'রুদ্রচণ্ড' রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশিত নাটক। আসলে ১৮৭৩তে রবীন্দ্রনাথ 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' যে নাট্যধর্মী রচনাটি লিখেছিলেন, তারই পরিবর্তিত রূপ হল 'রুদ্রচণ্ড'। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যপ্রয়াস, যা

গানের ছাঁচে ঢালা নয়। টমসন সাহেবের মতে, এটিই রবীন্দ্রনাথের 'First Important Drama', তবে এতে নাটকের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে তত্ত্ব। বলাবাহুল্য এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রসাহিত্য তথা জীবনদর্শনের প্রধান সুর— সীমা অসীমের মিলন। 'রাজা ও রানী' থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য একটি অন্যস্তরে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে 'রাজা ও রানী' রূপান্তরিত হয় 'তপতী' নামে। আদর্শায়িত প্রেমের সঙ্গে বাস্তবের দ্বন্দ্বজনিত বেদনার তীব্র মধুর প্রকাশ আছে 'রাজা ও রানী'তে। প্রকাশভঙ্গিতে এই গতানুগতিক। শেক্সপিয়রীয় রীতির অনুসরণ আছে এই নাটকে। আছে স্থূল, রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা; যা একান্তভাবে অরাবীন্দ্রিক।

'বিসর্জন' রবীন্দ্রনাথের বহু আলোচিত ও জনপ্রিয় একটি নাটক। বাহ্যত এই নাটকটি দেবীমন্দিরে জীব-বলিদানের বিরোধিতা নিয়ে রচিত। তাত্ত্বিক ভাষ্যে অবশ্য নাটকটি গড়ে উঠেছে প্রেম-প্রতাপের দ্বন্দ্ব নিয়ে। প্রতাপ-প্রতাপের অহংকারকে হারিয়ে জয়ী হয়েছে প্রেম। শেক্সপিয়রীয় কাঠামোয় বিন্যস্ত এই নাটকে প্রেমের পাই রাজা গোবিন্দমাণিক্য এবং অপর্ণাকে, অন্যদিকে প্রথা ও আচারসর্বস্বতায় আপাদমস্তক বিশ্বাসী রাজপুরোহিত রঘুপতি। দুয়ের মাঝে দোলাচলচিত্ত জয়সিংহ। তার আত্মবিসর্জন বেদনাবহ; তাতেই এসেছে রঘুপতি চরিত্রের কাঙ্ক্ষিত উত্তরণ। 'বিসর্জন'কে অনেক সমালোচক ট্রাজেডি হিসেবে চিহ্নিত করলেও তা ঠিক নয়; কারণ নাটকটি জয়সিংহের মৃত্যু বা তার পরবর্তীতে রঘুপতির হাহাকারের মধ্যে শেষ হয়নি। পাশ্চাত্য নাট্যবোদ্ধা টমসন সাহেবের মতো আমরা মনে করি, 'বিসর্জন' is the greatest drama in Bengali literature.

মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত 'চিত্রাঙ্গদা'তে প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুভবের পরিচয় পাওয়া যায়। 'চিত্রাঙ্গদা'য় অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রেম প্রথমে দেহকে আশ্রয় করেছে; পরে তা দেহাতীতের সন্ধান পেয়েছে। 'মালিনী' একটি ক্ষুদ্র নাটিকা 'বিসর্জনে'র মতো এখানেও রয়েছে দুটি আদর্শের বিরোধ। গ্রিক ট্রাজেডির মতো এর গঠন সংহত ও সংযত। কিন্তু আমরা নাটিকাটিকে ট্রাজেডি বলে মনে করি না। কারণ শেষ পর্যন্ত সব প্রকার হিংসাবিদ্বেষের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে চিরজয়ী সত্য।

(গ) নাট্যকাব্য : এই ধারার রচনাগুলিকে যথার্থভাবে নাটক বা নাট্যরচনা বলা যায় না। এগুলি আদতে নাট্যগুণসম্পন্ন কাব্য। আসলে 'চিত্রাঙ্গদা' থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটকে নাট্যধর্মিতাকে ছাপিয়ে যাচ্ছিল কাব্যধর্মিতা। নাট্যকাব্য সেই শিল্পীমানসের ফসল। কেউ কেউ বলেছেন এগুলি বিশেষধরনের শ্রুতিনাটক বা Reading drama-এর মতো। কারো মতে এদের মধ্যে নাটক উপায় আর কাব্য হল উদ্দেশ্য। এই ধারার রচনার উদাহরণ হল 'বিদায় অভিশাপ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', 'নরকবাস', 'সতী' ইত্যাদি।

(ঘ) কৌতুক নাটক : এই ধারায় উল্লেখযোগ্য রচনা 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬) এবং 'শেষরক্ষা' (১৯২৮)। 'গোড়ায় গলদ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য নাটক তথা প্রথম প্রহসন। এদিক থেকে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এর কৌতুকের মূলে রয়েছে একধরনের ভ্রান্তিবিলাস। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রথাগত ফর্মে উচ্চমানের প্রহসন। 'চিরকুমারসভা' রবীন্দ্র-উপন্যাস 'প্রজাপতির

নির্বন্ধ'-এর পরিমার্জিত নাট্যরূপ। প্রহসনধর্মী এই রচনায় রবীন্দ্রনাথ সংসার-বৈরাগ্য সন্ন্যাসের আদর্শের অন্তসারশূন্যতাকে তুলে ধরেছেন কৌতুকের ভঙ্গিতে। বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গির বিচারে 'চিরকুমার সভা' যেমন রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম, তেমনি বাংলা নাট্যসাহিতেও এটি একটি চিহ্নিত রচনা। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ 'গোড়ায় গলদ'কে সংস্কৃত ও পরিমার্জিত করে যে নতুন দান করেন, তাই হল 'শেষরক্ষা'। প্রহসন হিসেবে 'শেষরক্ষা' উচ্চাঙ্গের রচনা।

(ঙ) রূপক সাংকেতিক বা তত্ত্বনাটক : এই অভিনব ধারার শুরু 'শারদোৎসব' (১৯০৮) দিয়ে আর শেষে রয়েছে 'তাসের দেশ' (১৯৩৩)। মাঝে রয়েছে 'রাজা' (১৯১০), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'অচলায়তন' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯২২), 'রক্তকরবী' (১৯২৬), 'রথের রশি' (১৯৩১) বিখ্যাত রচনা। শরৎঋতুর আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে প্রেমের দ্বারা প্রকৃতির অকৃপণ দানের ঋণশোধ করার কথা ব্যক্ত হয়েছে 'শারদোৎসব' নাটকে। এর মূল চরিত্র রাজসন্ন্যাসী, কিন্তু সবচেয়ে সজীব চরিত্র নিঃসন্দেহে লক্ষেশ্বর। এই নাটক পরবর্তীকালে 'ঋণশোধ' নামে রূপান্তরিত হয়। বৌদ্ধ আখ্যান 'কুশজাতক'-এর কাহিনির নতুন ভাষা রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজা নাটকে। সমালোচকদের মতে, রাজা অরূপতত্ত্ব বিষয়ক নাটক। পরবর্তীকালে 'রাজা' হয়ে ওঠে 'অরূপরতন'। 'অচলায়তনে' রয়েছে অর্থহীন সংস্কার ও যুক্তিহীন আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ। যাকে উপলক্ষ্য করে আচারসর্বস্বতার অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে পড়ে, সে হল পঞ্চক। পঞ্চক এই নাটকের অন্যতম সজীব চরিত্র। অনেকের মতে, 'ডাকঘর' এই ধারার শ্রেষ্ঠতম নাটক। রুদ্ধগৃহবাসী বালক অমলকে সামনে রেখে এই নাটকে নিখিল মানবাত্মার বন্ধন মুক্তির পালাটি রচিত হয়েছে। অমলের একদিকে রয়েছে মাধব মোড়ল, কবিরাজ আর অন্যদিকে রয়েছে ঠাকুরদা ও সুধা। এইসব চরিত্রের তাত্ত্বিকতা সত্ত্বেও রচনাটি যথেষ্ট নাট্যরসাত্মক। 'ফাল্গুনী' রবীন্দ্রনাথের স্বল্প পরিচিত নাটক। এতে রয়েছে বসন্তের আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে চিরনবীনের বন্দনা। 'মুক্তধারা' রবীন্দ্রনাট্যধারায় পরিচিত নাম। যন্ত্রসর্বস্বতা ও হিংসাত্মক জাতীয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে। জনতা ও শিক্ষক চরিত্রটি বেশ সজীব। 'রক্তকরবী' এই ধারার বহুলচর্চিত নাটক। সভ্যতার সংকটকে খুব সংহত পরিসরে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে এই নাটকে। যন্ত্রগর্বিত ধনতন্ত্রের আগ্রাসন বনাম সহজসরল কৃষিসংস্কৃতি তথা স্বতঃস্ফূর্ত জীবনপ্রবাহের দ্বন্দ্ব এবং শেষপর্যন্ত জীবনপ্রবাহের জয় অনিবার্য হয়েছে, এই নাটকে। 'কালের যাত্রা' সংকলনভুক্ত 'রথের রশি' হল আধুনিক গণসচেতন ভারতীয় মানসের ম্যানিফেস্টো। এই ধারার শেষ উল্লেখযোগ্য নাটক 'তাসের দেশ'। রূপকথার মোড়কে এই নাটকে নির্জীব নিয়মবদ্ধ মানুষের মধ্যে নবীন প্রাণের সঞ্চার করা হয়েছে। নাটকে এই কাজটি করেছে লক্ষ্মীছাড়া, বিপদসঙ্কুল পথের অভিযাত্রী রাজপুত্র। নাটকটির উপস্থাপনভঙ্গির সরসতা বেশ উপভোগ্য।

(চ) সামাজিক নাটক : রবীন্দ্রনাট্যধারায় খুব ছোটো একটি পর্ব। এই পর্বে রাখতে পারি, 'শোধবোধ' (১৯২৬) এবং 'বাঁশরি' (১৯৩৩)কে। 'শোধবোধ' হল 'কর্মফল' গল্পের নাট্যরূপ। এতে রয়েছে নগরনির্ভর

উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের বাস্তব চিত্রণ। 'বাঁশরি' সংলাপ ও শণিত বাক্যে মাঝে মাঝেই মনে পড়িয়ে দেয় শেষের কবিতাকে। নাটক হিসেবে উল্লেখযোগ্য নয়।

(ছ) নৃত্যনাটক : রবীন্দ্রনাট্যধারার শেষপর্যায়। এতে রয়েছে 'নটীর পূজা' (১৯২৬), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩০), 'চণ্ডালিকা' (১৩৪৪) এবং 'শ্যামা' (১৩৪৬) এর মতো রচনাগুলি। বিষয়বস্তুতে নয়, এগুলির অভিনবত্ব প্রকাশরূপ ও প্রয়োগরীতিতে। 'নটীর পূজা'র অবলম্বন হল 'পূজারিণী' নামক কবিতা। কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' থেকে নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' রূপান্তরিত। 'চণ্ডালিকা'তে নাটক কম, প্রাধান্য পেয়েছে গীতিকাব্যধর্মিতাকে নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে 'শ্যামা'র আবেদন ও জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি।

রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা নাটককে একটা স্বতন্ত্র আকৃতিপ্রকৃতি দান করলেন বলা যায়। পাশ্চাত্যের প্রসেনিয়াম মঞ্চের তিন দেওয়ালে আবদ্ধ নাটককে তিনি মুক্ত করলেন। এইজন্যই দেখি, পথ তাঁর নাটকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। বস্তুসর্বস্বতা থেকে নাটককে তিনি মুক্তি দিলেন। তা বলে, জীবনবহির্ভূত কোনো তত্ত্বের কথা তিনি আওড়ালেন না। বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রের সমস্যা নয়; নাটকের বিষয় হল—সভ্যতার সংকট মনুষ্যত্ত্বের' সংকট। এই সংকট-নিরসনের দিশাও তিনি তাঁর মতো করে ভেবেছেন এবং তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাট্যব্যঞ্জনার মধ্যে। জনতা তাঁর নাটকে যেমন জীবন্ত, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গীত নিছক বিনোদনের জন্য নয়, রবীন্দ্রনাথ দেখালেন, সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই প্রবেশ করতে হয় নাটকের অন্তঃপুরে। সাধারণ পাঠকদর্শকের প্রথম পরিচয়ে রবীন্দ্রনাটককে 'অন্যরকম' বা 'সহজপাচ্য নয়' এমন মনে হতেই পারে। আসলে এ হল ঋষিপ্রতিম কবির কলমে লেখা নাটক; বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা সেখানে এসেই যায়। কিন্তু দীক্ষিত পাঠকের শ্রমের মূল্যে রবীন্দ্রনাটকের গভীরতা, বৈচিত্র্যময়তা, প্রসঙ্গিকতা, সর্বোপরি মানবজীবনমৃমিনতা বুঝতে পারা যায়। নাটকের আঙ্গিক নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা রবীন্দ্রনাটককে পুরোনো হয়ে যেতে দেয়নি এখনও। বোঝা যায় একশো বছর বা তার থেকে বেশি সময় পরেও রবীন্দ্রনাটক আমরা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারিনি; এখনও নতুন পাঠের অপেক্ষায় রয়েছে রবীন্দ্রনাঠক।

একক ১৮ ❑ বিজন ভট্টাচার্যের নাটক

বিজন ভট্টাচার্য এমন একজন নাট্যকার যাকে বুঝতে গেলে এক বিশেষ দেশকালের কথা— তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময় সংলগ্ন বাংলাদেশের কথা জানতেই হয়। জানতে হয় বিশশতকের প্রথমার্ধের পৃথিবীর বদলের ছবিটাও। ইতিহাসের অল্পবিস্তর খোঁজখবর যারা রাখি, তারা জানি ১৯১৪তে সংখ্যাটিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা। বলা যায় এরপর থেকেই বদলাচ্ছিল আমাদের চেনা পৃথিবীটা। বদলাচ্ছিল মানুষের জীবনযাত্রা—চিন্তাভাবনা সবকিছু। দ্রুত এগিয়ে আসছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা। দুটো বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে পৃথিবীতে ঘটে যাচ্ছিল বড়ো বড়ো মাপের নানান ঘটনা। একদিকে সোভিয়েত বিপ্লব, তাসখণ্ডে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্টা, ক্রমশ ভারতবর্ষ তথা বাংলায় তার প্রসারৃ নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠা (পরে এর থেকে তৈরি হয় ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ), প্রগতিশীলছাত্র যুবাদের যুদ্ধ-বিরোধী সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট Youth Cultural Institute বা Y.C.I.এর সদস্য ছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শম্ভু মিশ্র, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ। অন্যদিকে বিশ শতকের তিরিশের দশকে বিশ্বব্যাপী দেখা যায় স্বৈরতন্ত্রী শক্তির বিপুল উত্থান। শেষপর্যন্ত সীমিত মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করে বিশ্বজুড়ে শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯) ব্রিটিশ কলোনি ভারতবর্ষও তাতে জড়িয়ে পড়ল পরোক্ষভাবে। ব্রিটিশবিরোধী অক্ষশক্তি জাপান বর্মা জয় করে হানা দিলো কলকাতায়। বাংলা তথা কলকাতা তখন ভেতরে ভেতরে চরম অস্থির— ভারতছাড়ো আন্দোলন, আগস্ট আন্দোলন, ইংরেজের পোড়ামাটি নীতি, সুযোগ বুঝে চোরা কারবারিদের রমরমা। গ্রামবাংলায় নেমে এলো কৃত্রিম মহামন্বন্তর—খাবারের জন্য হাহাকার। সাধারণ মানুষের দুর্দশা দেখে শিউরে উঠলো বিবেকবান বুদ্ধিজীবী মানুষেরা। সময়ের দাবিতে এঁরাই গঠন করলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (১৯৪৩)। নিছক বিনোদনের থিয়েটারকে বাতিল করে গর্জে উঠলো বাংলা থিয়েটারের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সংঘের বাংলার প্রাদেশিক কমিটিতে ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, সুধীপ্রধান, জলি কাউল, বিষ্ণু দে, সুজাতা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এই গণনাট্য, কী, কেন— এই প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজে নিতে পারি, বিজন ভট্টাচার্যের কথা থেকেই। তিনি বলেন—

> মানুষের কল্যাণে রুটির লড়াইয়ের সঙ্গে প্রাণের লড়াইকে একসূত্রে বেঁধে নাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হল গণনাট্যের মূল কথা।

বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যচর্চায় একথার মূল্য কোনো-না-কোনোভাবে থেকেই গেছে।

বিজন ভট্টাচার্য জন্মেছিলেন বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। কিন্তু বাবার চাকরিসূত্রে নানা জায়গা ঘুরে এসে পৌঁছান কলকাতায়। এখানে ছাত্রজীবনেই জড়িয়ে পড়েন জাতীয় আন্দোলনে। পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে যোগ দেন ছাত্র আন্দোলনে। যুক্ত হন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। সাংবাদিকতার চাকরি একটা পেয়েছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পেয়ে সেই চাকরি ছেড়ে দেন। হয়ে ওঠেন পার্টির

সর্বক্ষণের কর্মী। এই সময়েই সমষ্টি মানুষের পাশে থাকার জন্য সংঘের ছত্রছায়ায় নাটক রচনায় হাত দেন।

বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক— একটি একাঙ্ক— নাম 'আগুন' (১৯৪৩)। 'জবানবন্দী' নামে আরও একটি একাঙ্ক এই বছরেই লেখেন। লেখেন 'নবান্ন' (১৯৪৪) এর মতো বিখ্যাত নাটক। এই 'নবান্ন'এর প্রযোজনা দিয়ে বলা যায় বাংলা গণনাট্যের জয়যাত্রা শুরু হয়। 'নবান্ন' বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। তাঁর অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ নাটকের তালিকাটি এইরকম:

নাটকের নাম	**মঞ্চ প্রকাশকাল**	**গ্রন্থ প্রকাশকাল**
'অবরোধ'	—	১৯৪৭
'জীয়ন কন্যা' (গীতিনাট্য)	১৯৪৭	১৯৪৮
'জতুগৃহ'	—	১৯৫২ (পত্রিকা)
'গোত্রান্তর'		১৯৫৯ ১৯৫৭
'ছায়াপথ'	১৯৬১	১৯৬২
'মরাচাঁদ'	১৯৬১	১৯৬১
'মাস্টারমশাই'	১৯৬১	—
'দেবীগর্জন'	১৯৬৬	১৯৬৯
'ধর্মগোলা'		১৯৬৭ —
'কৃষ্ণপক্ষ'	১৯৭৫	১৯৬৬ (পত্রিকা)
'গর্ভবতী জননী'	১৯৬৯	১৯৭১
'আজ বসন্ত'	১৯৭২	১৯৭০ (পত্রিকা)
'সোনার বাংলা'	১৯৭১	—
'চলো সাগরে'	১৯৭৭	১৯৭২

'আগুন', 'জবানবন্দী' ছাড়াও বিজন ভট্টাচার্য যেসব একাঙ্ক রচনা করেন, সেগুলি হল— 'মরাচাঁদ' (এই নামে পরে পূর্ণাঙ্গনাটকও রচনা করেন) 'কলঙ্ক', 'জননেতা', 'মল্লিক', 'স্বর্ণকুণ্ড', 'চুল্লী' এবং 'হাঁসখালির হাঁস'।

'আগুন' একাঙ্কের বিষয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন গ্রাম বাংলায় ও শহর কলকাতায় সাধারণ মানুষের

খাদ্যাভাব—ক্ষুধার জ্বালা। এই জ্বালা থেকেই মানুষগুলি কৃত্রিম খাদ্যাভাবের বিরুদ্ধে গলা মেলায় একসঙ্গে। 'জবানবন্দী'তেও রয়েছে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ প্রেক্ষিত। কিন্তু হেরে যাওয়াতে এই নাটক শেষ হয় না। শহরের ফুটপাথে মৃত্যুমুখী পরাণ মণ্ডলের জবানবন্দীর মধ্যে উচ্চারিত হয় বাঁচার শপথ। 'জবানবন্দী'তে যা ছিল খসড়া আকারে, 'নবান্ন' তারই বিসৃত রূপ। আকালকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও আকালের কথাতে নাটক শেষ হয়নি। আকালের কারণানুসন্ধান এবং প্রতিকারের পথ চিহ্নিত করা হয়েছে এই নাটকে। সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ কী করে সোনাধানের স্বপ্নকে সত্য করে তুলতে পারে, তার ইঙ্গিত আছে নাটকশেষে।

'অবরোধ' শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে লেখা। আসলে বামপন্থী শ্রমিকদের আপসহীন মনোভাব ও কার্যধারা স্বাধীন ভারতের গোড়াতেই বিজন ভট্টচার্য উপলব্ধি করেছিলেন। 'অবরোধ' তারই ফসল 'জীয়নকন্যা' গীতিনাট্যের ভঙ্গিতে লেখা রূপক নাটক। প্রেক্ষাপটে রয়েছে বেদে জীবনের ছবি। এই নাটকে বেদে কন্যা উলুপীর সর্পদংশনে মৃত্যু এবং হিন্দু মুসলমান ওঝা-গুনিন এর সমবেদ সাধনায় কন্যার প্রাণ ফিরে পাওয়া আসলে দেশভাগকালীন সাম্প্রদায়িক হানাহানির ফলস্বরূপ নিজেদের মৈত্রীর বিনষ্টি এবং পরে অনেক ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে আমাদের অন্তরের আকুতিতে আত্মোপলব্ধিতে পৌঁছানোর আখ্যান। স্বাধীনোত্তর উচ্চবিত্ত মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও লোভের আগুন কীভাবে তাদের পুড়িয়ে মারে, সেই বৃত্তান্ত নিয়ে লেখা 'জতুগৃহ'। বিজন ভট্টাচার্যের প্রতিনিধি স্থানীয় রচনা নয়; বরং 'গোত্রান্তর' উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম। বাইরে থেকে মনে হতে পারে, 'গোত্রান্তর' দেশভাগজাত ছিন্নমূল মানুষের সমস্যা নিয়ে রচিত, তা কিন্তু নয়। এই নাটকে আমরা পাই, তথাকথিত ভদ্রালোক শ্রেণিভুক্ত কিন্তু উদ্বাস্তু হরেন্দ্র কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে শ্রমিকশ্রেণির একজন হয়ে ওঠেন, সেই উত্তরণের আলেখ্য। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় হরেণবাবু বুঝতে পারেন, তার মেয়ে গৌরীর মানসম্ভ্রম কেড়ে নিতে চায় যে বড়োলোক বাবুরা, তারা তাঁর স্ব-শ্রেণিভুক্ত নয়। তাঁর কাছের লোক বস্তির ঐ তথাকথিত শ্রমিকেরা, এদেরই একজন কানাই, যে তাঁর মেয়েকে বড়োলোক দুর্বৃত্তদের হাত থেকে বাঁচায়। তাই নাটক শেষাংশে তিনি কানাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেন মেয়ে গৌরীর। এইভাবেই ঘটে যায় ভদ্রলোক হরেণবাবু লোকান্তর।

কলকাতার ফুটপাথবাসী ভিখিরিদের নিয়ে প্রায় নাটক লেখেন বিজন ভট্টাচার্য। সেই নাটক হল 'ছায়াপথ'। 'মরাচাঁদ' নামে প্রথমে একাঙ্ক রচনা করেন, পরে সেটিকে পূর্ণাঙ্গ নাটকে রূপ দেন। এই নাটকের কেন্দ্রীয়চরিত্র অন্ধ লোকশিল্পী পবন। তার ভালোবাসার নারী যখন তাকে ছেড়ে চলে যায় অন্য মানুষের কাছে, তখন প্রবলভাবে ভেঙে পড়ে পবন। তবে শেষপর্যন্ত ফাটাগলায় ভাঙাঘর জোড়া লাগাবার গান গায় পবন। 'দেবীগর্জন' বিজন ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকর্মগুলির একটি। এর মূল বিষয় হল স্বাধীনতা পরবর্তী রচনায় ভুঁইচাষী, ভাগচাষীদের উপর জোতদারের ছলে-বলে-কৌশলে শোষণ। আর জোতদারের এই শোষণের ডানহাত হল ভণ্ড এক জননেতা। শেষপর্যন্ত শোষিত সর্বহারা কৃষকপ্রজারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের অধিকার

বুঝে নেয়। নারী নিপীড়নকারী জোতদারের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দেয়। পালিয়ে গিয়েও বাঁচে না, ধরা পড়ে বিক্ষুব্ধ কৃষকদের হাতে। লোকঐতিহ্যও লোকপুরাণের ব্যবহারও এই নাটকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গণনাট্যের শর্তের নিরিখেও এই নাটক উত্তীর্ণ। 'ধর্মগোলা' এই ভাবধারাই নাটক। 'গর্ভবতী জননী' বিজন ভট্টাচার্যের বিখ্যাত নাটক। এর প্রেক্ষাপটেও রয়েছে বেদে জীবন ও সংস্কৃতি। এই নাটকের বার্তা— জীবন্মৃত হয়ে বাঁচা যায় না, জীবনকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই বড়ো কথা। দেশনেতারা ভাঁওতা দেয় ওঝার মতো— মা আবার গর্ভবতী হবেন, মা আবার গর্ভবতী হচ্ছেন। সমস্তটাই স্তোকবাক্য। ফাঁকিটা ধরতে পারেন এই নাটকের মামা— বিবেক ধরনের চারিত্র। বেদে সমাজের কেউ যখন বলে ওঠে, 'একদণ্ড বাঁচবার ইচ্ছে নেই'। মামা বলেন— 'তবু বাঁচতি হবে রে। এও এট্টা দায়'। এখানেই নাটকটির আবেদন। 'আজ বসন্ত' কেটি পরীক্ষামূলক নাটক। উদারা, মুদারা ও তারা— নাটকের তিনটি অঙ্ক। যার মধ্য দিয়ে দেখানো হয় যুবসমাজের নৈরাশ্য ও বেদনা এবং শেষপর্যন্ত গানের সুরে জীবনকে গেঁথে নেওয়া। একাঙ্কগুলির মধ্যে 'হাঁসখালির হাঁস' এর কথা না বললেই নয়। কলকাতায় পবাতালরেল তৈরি হওয়ার পটভূমিতে লেখা এই নাটক। মাটি কাটার কাজ করবার জন্য গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ চলে আসছে। কলকাতাতে সুন্দর ও গতিময় করে তোলার জন্য ঐ মানুষগুলিকে নষ্ট করতে হচ্ছে নিজেদের শেকড়। তারপর বাঁচার জন্য তীব্র লড়াই— তা এমনই যে যুবতী মেয়েকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নামতে হয় দেহব্যবসায়। আর তখনই 'মর্মান্তিক এই অভিসার লক্ষ্য করে এক ঝাঁক পাখির কলকাকলিতে বিপদসংকেত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোথায় একটি বাঘ বেরিয়েছে হরিণের সন্ধানে...' নাট্যকারের অভিপ্রেত ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত কোনদিকে বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।

বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যপরিক্রমা শেষে আমরা বলতেই পারি, বাংলা থিয়েটারের আলোকোজ্জ্বল অধ্যায় যদি হয় গণনাট্য-নবনাট্যধারা, তবে তার অগ্রণী নাট্যব্যক্তিত্ব তথা নাট্যকার নিঃসন্দেহে বিজন ভট্টাচার্য। তাঁর 'নবান্ন' দিয়ে শুধু ভারতীয় গণনাট্য সংঘ নয়, বাংলা থিয়েটারের নতুন অধ্যায় পথচলা শুরু করে। বিষয় ও প্রকরণের দিক থেকে বাংলা নাট্যসাহিত্যে এ ছিল একেবারে নতুন।

অনুশীলনী

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী:

১। বাংলা নাট্য ও রঙ্গমঞ্চের আদিপর্ব বলতে কী বোঝায়? এই পর্বের নাট্যচর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করুন।

২। প্রাক্ মধুসূদন নাট্যসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নাট্যব্যক্তিত্বের নাম বলুন। বাংলা নাট্যরচনায় তাঁর অবদান আলোচনা করুন।

৩। বাংলা নাট্যসাহিত্যে মধুসূদনের কৃতিত্ব পরিমাপ করুন।

৪। বাংলা নাট্যসাহিত্যে মধুসূদন ও দীনবন্ধুর মধ্যে কাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন? আপনার উত্তরের সপক্ষে কারণ ব্যাখ্যা করুন।

৫। কোন দুটি নাটকের জন্য দীনবন্ধু কালজয়ী খ্যাতি পেয়েছেন? নাটকদুটি সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করুন।

৬। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সাফল্য ব্যর্থতা পরিমাপ করুন।

৭। নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন কখন চালু হয়? এর প্রেক্ষিত ও বাংলা নাট্যচর্চায় এর প্রভাব আলোচনা করুন।

৮। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বকীয় অবস্থানটি চিহ্নিত করুন।

৯। রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যের পরিচয় দিয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যে তার স্বাতন্ত্র্য আলোচনা করুন।

১০। বাংলা গণনাট্য-নবনাট্য ধারার উদ্ভব ও বিকাশে বিজন ভট্টাচার্যের অবদান আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী:

১। বাঙালি প্রতিষ্ঠিত কোন নাট্যকার বাংলায় প্রথম নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়? নাট্যাভিনয়টির নাম ও সময়কাল উল্লেখ করুন।

২। বাংলা প্রথম মৌলিক নাটকের নাম কী? রচয়িতার নাম ও প্রকাশকাল উল্লেখ করুন।

৩। প্রথম কোন মৌলিক বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হয়? এটির প্রকাশকাল ও রচয়িতার নাম লিখুন।

৪। মধুসূদনের প্রথম নাটক কোন্‌টি? এর কাহিনি কোথা থেকে গৃহীত?

৫। মধুসূদন ও দীনবন্ধুর কোন কোন প্রহসনের মধ্যে বিষয়গত মিল রয়েছে?

৬। বাংলা নাট্যসাহিত্যের 'নীলদর্পণ'-এর গুরুত্ব কোথায়?

৭। গিরিশচন্দ্রের দুটি সামাজিক নাটকের নাম লিখুন।

৮। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কোন রচনাটি বিতর্কিত? কেন বিতর্কিত?

৯। রবীন্দ্রনাথের কোন নাটকগুলি রূপক-সাংকেতিক অভিধায় চিহ্নিত?

১০। বাংলা নাট্যধারায় 'নবান্ন' কেন বিখ্যাত?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৩য় খণ্ড), সুকুমার সেন (আনন্দ পাবলিশার্স)

২। 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', অজিত কুমার ঘোষ (জেনারেল পাবলিশার্স)

৩। ‘বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস’, ক্ষেত্র গুপ্ত (গ্রন্থনিলয়)

৪। ‘বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৪০

৫। ‘বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার’, সুবীর রায়চৌধুরী (সম্পাদক), দে’জ পাবলিশিং, ১৯৭২

৬। ‘বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক’, পুলিন দাস (এম.সি. সরকার)

৭। ‘বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস’, দর্শন চৌধুরী (পুস্তক বিপণি)

৮। ‘বাংলা প্রহসনের ইতিহাস’, অশোককুমার মিশ্র (মডার্ন বুক এজেন্সি)

৯। ‘রবীন্দ্রনাটক: আলোকিত উদ্ভাবন’, কুমার রায় (মিত্র ও ঘোষ)

১০। ‘নাট্য আকাদেমি পত্রিকা’ (৫ম সংখ্যা), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

নোটস্

নোটস্

মডিউল-৪

উপন্যাস ও ছোটোগল্প

মডিউল (পর্যায়) ৪ : উপন্যাস ও ছোটোগল্প

উদ্দেশ্য

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে, আধুনিক পর্বের ইতিহাসে কথাসাহিত্য বা গল্পসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা অপরিহার্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় কাব্য-নাটক-প্রবন্ধাদির সঙ্গে কথাসাহিত্য বা গল্প-উপন্যাসের পরিচয় ও সে-বিষয়ে ধারণা একজন শিক্ষার্থীকে সামগ্রিক জ্ঞানের অধিকারী করে তুলবে। উনিশ শতকে আধুনিক গল্প-উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটেছিল, তার সূচনা ও বিকাশের সংহত পরিচয় দান এই পাঠ-পর্যায়ের উদ্দেশ্য।

গঠন

একক ১৯ বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ

১৯.১ ভূমিকা : বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ

১৯.২ বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের সূচনা

১৯.৩ সংক্ষিপ্তসার

একক ২০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

একক ২১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

একক ২২ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

একক ২৩ অন্যান্য ঔপন্যাসিক

২৩.১ ভূমিকা

২৩.২ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩.৩ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩.৪ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩.৫ সতীনাথ ভাদুড়ী

২৩.৬ অদ্বৈত মল্লবর্মণ

একক ২৪ বাংলা ছোটোগল্প

অনুশীলনী

একক ১৯ ❑ বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ

১৯.১ ভূমিকা

কথাসাহিত্যের 'কথা' শব্দের অর্থ গল্প। অতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে গল্প বলা বা লিখে রাখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সেইসব গল্পের নানা রূপ, নানা বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য। কালে কালে দেশে দেশে গল্প বলার ভঙ্গীরও বিবর্তন ঘটেছে। বঙ্গদেশেও সেই গল্প বলা ও লেখার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে প্রাগাধুনিক অর্থাৎ উনিশ শতকের পূর্ববর্তী গল্প বা কথা এবং উনিশ শতকের যে কথাসাহিত্যের আলোচনা করা হচ্ছে, উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

আধুনিক কথাসাহিত্য পাশ্চাত্যের কথাসাহিত্যের প্রভাব-সঞ্জাত নতুন ধরনের প্রকরণ। এই কথাসাহিত্য মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত— উপন্যাস ও ছোটোগল্প। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে 'উপন্যাস' শব্দটি ইংরেজির 'নভেল' ও 'রোম্যান্স' শব্দদুটির বাংলা পরিভাষা হিসাবে প্রচলিত হয়েছে। উভয় প্রকার রচনায় সমস্ত লক্ষণ সমান হলেও বাস্তবতা ও কল্পনার মাত্রায় উভয়ের পার্থক্য— রোম্যান্সে কল্পনার আধিক্য, অপরপক্ষে নভেল বাস্তব জীবনের ছবি। আমাদের বর্তমান আলোচনায় এই দুই প্রকরণের সূচনা ও বিকাশের পরিচয়ই বিবৃত হয়েছে।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে ইউরোপীয় মিশনারি, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং রাজা রামমোহন রায় প্রমুখের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যের চর্চা শুরু হলে আধুনিক কথাসাহিত্যের সম্ভাবনা দেখা দেয়, কারণ উপন্যাস ও ছোটোগল্প উভয়েরই বাহন গদ্য। তাই নব্য কথাসাহিত্য, অর্থাৎ উপন্যাস ও ছোটোগল্পের বাহক বা মাধ্যম হিসাবে গদ্যের প্রচলন কাঙ্ক্ষিত ছিল, কেননা এর আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য পদ্যেই রচিত।

এই সময়ে অর্থাৎ বাংলা গদ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগে, যখন সাহিত্যিক গদ্যের মান্যরূপ তৈরি হয়নি, সেই সময় মৌলিক গদ্যকাহিনি পাওয়া গেল রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১)। এটিকে কথাসাহিত্যের উদাহরণ হিসাবে ধরা না গেলেও গদ্য-আখ্যানের সূচনা বলা যায়। আর সমকালীন কলকাতার সামাজিক জীবনের কথা নিয়ে বাস্তবধর্মী গদ্য রচনার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫), 'কলিকাতা কমলালয়' প্রভৃতি রচনায় এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নক্শায়। এগুলিতে উপন্যাসের ঠিক লক্ষণ পাওয়া যায় না, আখ্যানমাত্র। এই সময় এই নক্শা জাতীয় রচনা, এবং বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, কৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রভৃতি সাহিত্যিকের রচনা সে যুগের গতানুগতিক বিদ্যাসুন্দর, 'চৌরপঞ্চাশৎ', 'আরব্য উপন্যাস', 'পারস্য উপন্যাস' প্রভৃতির গণ্ডী থেকে বাঙালি পাঠককে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল।

একথা স্মরণ রেখে বলতে হয় টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্র) 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) রচনাতেই প্রথম উপন্যাসের লক্ষণ অর্থাৎ গদ্যেলেখা আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত সম্পূর্ণ বাস্তব কাহিনী

অনেকাংশে পাওয়া যায়। কিছু অসংলগ্নতা বা ত্রুটি থাকলেও বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের সূচনা এটিকে বলা যায়। এরই প্রায় সমকালে রচিত হানাক্যাথরিন ম্যুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২), লালবিহারী দের 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' (১৮৫৯), ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস [দুই খণ্ডে— 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৬২) ও 'সফল স্বপ্ন (১৮৬৩) বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা উপন্যাসের প্রস্তুতি-পর্ব। ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ইতিহাস-আশ্রিত রোম্যান্স 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের মধ্য দিয়েই সার্থক বাংলা উপন্যাসের সূত্রপাত হল। ১৮৭২ সালে তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিষবৃক্ষ'-ই বাংলার প্রথম বাস্তবধর্মী উপন্যাস বা নভেল। ইতিহাস-আশ্রিত রোম্যান্স, সামাজিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন আঙ্গিকের মোট ১৪টি উপন্যাস রচনা করে বাংলা উপন্যাসের ধারাকে সমৃদ্ধ করলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে এবং উৎসাহে রমেশচন্দ্র দত্ত, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ বাংলা উপন্যাস রচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। এছাড়াও প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বর্ণকুমারী দেবী, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি লেখকগণের নাম বাংলা উপন্যাসে সূচনা ও বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য।

উনিশ শতকের শেষে উপন্যাস রচনায় বঙ্কিম-অনুসারী লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বর্ণকুমারী দেবী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬ বছর বয়সে লেখা ১২৮৪ সালে 'করুণা' উপন্যাসটি তাঁর উপন্যাস রচনার প্রয়াস। সেই 'করুণা' থেকে চার অধ্যায় পর্যন্ত মোট ১৩টি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পিসত্তার বিচিত্র দিককে উন্মোচিত করেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর দানও উল্লেখযোগ্য, তাঁর 'কাহাকে?' উপন্যাসেই প্রথম মনতাত্ত্বিক উপন্যাসের লক্ষণ পাওয়া যায়। বিংশ শতকে বাংলা উপন্যাসের প্রধান ঔপন্যাসিকগণ হলেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রভৃতি শিল্পী।

আধুনিক কথাসাহিত্যের অন্যতম অর্থাৎ দ্বিতীয় ধারাটি হল *'ছোটোগল্প'*। এই ছোটোগল্প পূর্বাবধি প্রচলিত নানান ধাঁচের গল্পের চেয়ে ভিন্নতর এক শিল্পরূপ বা প্রকরণ। এর সংজ্ঞা, লক্ষণ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্র এটি নয়। তবে বলা যায়, এক নতুন ধরনের গল্প যা বড়গল্প, নীতিগল্প বা রূপকথার মতো নয়, উপন্যাসের ক্ষুদ্র সংস্করণও নয়। উনিশ শতকেই এই বিশেষ প্রকার গল্পের উদ্ভব এবং তা সাময়িক পত্রের তাগিদেই সৃষ্ট। ধারাবাহিকভাবে মাসের পর মাস চলতে থাকা উপন্যাসের পরিবর্তে একটি/দুটি সংখ্যায় জীবনের সামগ্রিক নয় খণ্ডিতাংশকে তুলে ধরে দ্রুত পরিণতিতে পৌঁছে পাঠকের মনে পূর্ণতারই স্বাদ এনে দেওয়াই ছোটোগল্পের লক্ষ্য।

বাংলা সাহিত্যে এই নতুন ধরনের গল্পের সূচনা উনিশ শতকের শেষের দিকে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১২৮০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের সহোদর "পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থনামা ছোটোগল্প"—[দ্র. ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্প ও গল্পকার,

১৯৮২, মডার্ন বুক এজেন্সি, পৃ.৬১] সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ভ্রমর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'অদৃষ্ট' এবং 'দামিনী'-ও উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প। এরপর উল্লেখ করতে হয় বাংলা ছোটোগল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। তাঁর 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত (১২৮৪ সালে শ্রাবণ, ভাদ্র সংখ্যায়) 'ভিখারিণী'কে সার্থক ছোটোগল্প বলা না গেলেও তাঁর গল্পরচনার সূত্রপাত এখানেই। যাই হোক, বাংলা ছোটোগল্পের সূচনা-পর্ব থেকে বিকাশ সবই রবীন্দ্রনাথের হাতে ঘটেছে, তাঁর 'ভিখারিণী' (১৮৭৭) থেকে 'মুসলমানীর গল্প' (১৯৪১) পর্যন্ত মোট ৯৪টি গল্প, তাঁর ৬৪-৬৫ বছরের গল্প রচনার কাল। রবীন্দ্রনাথের সমকালে বা পরবর্তীকালে ছোটোগল্প রচনায় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সতীনাথ ভাদুড়ী বাংলা ছোটগল্পের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

১৯.২ বাংলা উপন্যাস ও ছোটোগল্পের সূচনা

বর্তমান আলোচনার ভূমিকায় আমরা বাংলা উপন্যাস রচনার ধারায় তার সূচনা পর্বের কথা উল্লেখ করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি, বাংলা উপন্যাস ইংরাজি প্রভাব-সঞ্জাত এক শিল্প-প্রকরণ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক শিল্পী। তার আগেও উপন্যাসধর্মী রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস', 'কলিকাতা কমলালয়'—গ্রন্থদুটিতে উপন্যাসের লক্ষণ নেই, তবে গদ্য আখ্যান হিসাবে উল্লেখ্য। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা (***) সেই অর্থে আখ্যানধর্মী রচনাই নয়, নকশা-জাতীয় রচনা, যা সমকালীন কলকাতার খণ্ড খণ্ড চিত্র। তবে সার্থক উপন্যাস পাওয়ার আগে তার প্রস্তুতি পর্বের, ভূমিকাও কম নয়। বাংলা, উপন্যাসের উদ্ভবের ইতিহাসে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা প্রয়োজন। তাই সংক্ষেপে রচনাগুলির পরিচয় নেওয়া যাক।

প্রাক্-বঙ্কিম বাংলা উপন্যাস:

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ : হানা ক্যাথরিন ম্যুলেন্স

বাংলা উপন্যাস রচনার প্রথম যুগে উপন্যাসের লক্ষণযুক্ত যে-সব রচনা পাওয়া যায় প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুর) 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর পূর্বে প্রকাশিত একটি উপন্যাসধর্মী রচনার কথা উল্লেখ করতেই হয়, সেটি হল—হানা ক্যাথরিন ম্যুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২)। রচনাটি আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত সমকালীন বাস্তব সমাজের কাহিনী হলেও পাঠকসমাজে তত গুরুত্ব পায়নি। কারণ এখানে গল্পের চেয়ে উদ্দেশ্যমূলকতাই প্রকট হয়েছে। খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারই এর প্রধান উদ্দেশ্য। ফুলমণি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে সুখে শান্তিতে বাস করে আর করুণা খুব কষ্টে দিন কাটায়। তারপর ফুলমণির পরামর্শে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে যিশুর কৃপায় সে সুখ-শান্তি লাভ করে। স্বভাবতই ধর্মীয় মাহাত্ম্য প্রচার পাঠক সমাজে গুরুত্ব পায়নি।

'আলালের ঘরের দুলাল' : প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর)

লেখকের স্ব-সম্পাদিত পত্রিকা 'মাসিক পত্রিকা'য় ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ থেকে প্রকাশিত, গ্রন্থাকারে ১৮৫৮ সালে প্রকাশ পায়। গ্রন্থটিতে উত্তরপাড়া অঞ্চলের ধনীর সন্তান কলকাতায় এসে কুসঙ্গে পড়ে কীভাবে অধঃপাতে গেল তার পরিচয় প্রকাশিত। রচনাটি বাঙালির ঘরের কথা মুখের ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। সেদিক থেকে উপন্যাসের লক্ষণ কিছুটা আছে বলা যায়। তবে এটি শুধু ঘটনা পরম্পরার বিবরণমাত্র হয়ে উঠেছে, জীবন বিশ্লেষণ বা লেখকের জীবনদর্শনও প্রতিফলিত হয়নি। রচনাটি সম্পর্কে সমালোচক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য এখানে উল্লেখ্য— "রোমান্টিক আখ্যান ও বাললোভন রূপকথার জলাভূমি পার হইয়া সর্বপ্রথম উপন্যাসের আবির্ভাব হইল— 'আলালের ঘরের দুলাল' তাহার সার্থক সূচনা। উপন্যাসের লক্ষণ মিলাইয়া এই নক্শা জাতীয় আখ্যানটিকে কিছুতেই সার্থক উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে না;..." [দ্র. 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য', ১৯৬৫, পৃ. ৪৪৪-৪৪৫] স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন— "তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে...।" [দ্র. লুপ্ত রত্নোদ্ধার, ১৮৯২]

যাই হোক, রচনাটিতে উপন্যাসের লক্ষণ সমকালীন অন্যান্য লেখকের তুলনায় অধিক পরিমাণে থাকলেও বিষয়বস্তু, কাহিনীবিন্যাস, মুখের ভাষার প্রয়োগে এটি আধুনিক নভেলের শর্ত পূরণ করলেও, সার্থক বা পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। তবে এটিকে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে নভেলের সূচনা বলা যায়।

চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান : রেভারেণ্ড লালবিহারী দে

প্যারীচাঁদ মিত্রের অনুসরণ করে আর একজন চলিত ভাষায় বিশেষ অঞ্চলের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন, তিনি হলেন রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। মধ্যবঙ্গের গ্রামজীবনের জবি 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। একটি আখ্যান আছে ঠিকই কিন্তু তাকে উপন্যাসের পঙ্‌ক্তিভুক্ত করা যায় না। এবিষয়ে সুকুমার সেনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য— "বইটি উপন্যাস নয়, গল্পও নয়— পল্লীজীবনের চালচিত্র।" [দ্র. 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ১৩৮৬ সং, পৃ. ১২৩]

ঐতিহাসিক উপন্যাস : ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতি মূলত প্রাবন্ধিক হিসেবে। তিনি ইতিহাস ভিত্তি করে দুখানি উপন্যাসধর্মী গ্রন্থ রচনা করেন— ১) ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৬২/৬৩), ২) স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৯৫)। ঐতিহাসিক উপন্যাসে দুটি কাহিনী আছে— 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরী বিনিময়'। কন্‌টারের কল্পনাভিত্তিক রচনা Romance of History—India' থেকে কাহিনী দুটি গৃহীত। 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' ইতিহাস-মিশ্রিত রোমান্টিক কাহিনী পরিবেশিত।

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে তৃতীয় পাণিপ্যথর যুদ্ধ অন্যভাবে শেষ হলে কী হত—সেই নিয়ে কল্পিত কাহিনী। গল্পটি মৌলিক হলেও ঔপন্যাসিক রস প্রকাশিত হয়নি।

১৯.৪ সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান আলোচনায় দেখা গেল, আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের (উপন্যাস ও গল্প) সূচনা, উনিশ শতকে বাংলা গদ্যচর্চা শুরু হওয়ার পর। পাশ্চাত্য প্রভাবজাত আধুনিক উপন্যাসের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তার আগে নকশা-জাতীয় রচনা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যানধর্মী রচনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' ও 'কলিকাতা কমলালয়', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা প্রভৃতি নকশাজাতীয় রচনা বাংলা উপন্যাসের পথকে সূচিত করে। তাছাড়াও উল্লেখযোগ্য আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত আখ্যান বা কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। হানা ক্যাথরিন ম্যুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ) 'আলালের ঘরের দুলাল', লালবিহারী দের 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান'-এ উপন্যাসের লক্ষণ বর্তমান। এদের মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ স্পষ্টতর। তবে তাকে সার্থক উপন্যাস বলা হয় না, কারণ কাহিনী সম্পূর্ণ হলেও শুধুমাত্র ধারাবাহিক বর্ণনাই হয়েছে, লেখকের জীবনবিশ্লেষণ বা জীবনদর্শনের কোনো ইঙ্গিত নেই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত 'দুর্গেশনন্দিনী'ই প্রতম সার্থক উপন্যাস।

এই সময়েই অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষভাগেই আধুনিক ছোটোগল্পের প্রকাশ। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেই ছোটগল্পের সূচনা ও বিকাশ।

একক ২০ ❑ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

বাংলা উপন্যাস শিল্পের সার্থক শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, একথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁকে বাংলা উপন্যাসের পথ প্রদর্শক বলা যায়। বস্তুত বাংলা উপন্যাসের সূচনা, অগ্রগতি সমৃদ্ধি তাঁর হাতেই। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "বঙ্কিমের হাতে বাংলা উপন্যাস পূর্ণ যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে। (দ্র. 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', ষষ্ঠ অধ্যায়)।

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ১৪— 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রাধারানী' (১৮৮৬), 'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'রাজসিংহ' (১৮৮২), 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরানী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭)।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সাধারণ বিশেষত্ব (রচনারীতি ও গঠনবৈশিষ্ট্য) :

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস মূলত ঘটনাপ্রধান। তাঁর রোমান্সধর্মী উপন্যাসগুলিতে প্রাক্-আধুনিক ভারতের ইতিহাসই পটভূমি। আর সমকালীন ভারত বা বঙ্গভূমি 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই চারখানি উপন্যাসের পটভূমি। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে 'ইন্দিরা', 'রাধারানী', 'যুগলাঙ্গুরীয়' ক্ষুদ্র উপন্যাস বা উপন্যাসিকা। শেষের উপন্যাসগুলিতে 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী', 'সীতারামে' গীতার আদর্শবাদ, নৈতিকতা প্রভৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। তাই এগুলিকে অনেকে তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস বলতে চেয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসই বিবৃতিধর্মী ও বর্ণনামূলক। তবে 'ইন্দিরা' ও 'রজনী' আত্মকথনধর্মী। 'ইন্দিরা'য় ইন্দিরার জবানিতে কাহিনীবিবৃত, 'রজনী' উপন্যাসে রজনী-অমরনাথ-লবঙ্গলতা-শচীন্দ্রনাথের জবানিতে কাহিনী বর্ণিত।

গঠনবৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে বলা যায় (১) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্লটরচনা পূর্ব-পরিকল্পিত। মহাকাব্য বা নাটকের মত খণ্ড ও পরিচ্ছেদ বিভাগ, সেগুলির নামকরণ সবই আকস্মিক নয় পূর্ব-পরিকল্পিত। প্রতিটি পরিচ্ছেদ কার্য-কারণসূত্রে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। (২) মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনী যোগ করে কাহিনীর পরিপুষ্টি সাধন করা হয়েছে। (৩) কাহিনীর মধ্যে স্বপ্ন, পত্র, গান যোগ করে গল্পের অগ্রগতি ও স্পষ্টতা সাধিত হয়েছে।

উপন্যাসগুলির পরিচয়:

দুর্গেশনন্দিনী : বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ' (১৮৬৪) ইংরেজিতে লেখা। তাঁর বাংলায় লেখা প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত। উপন্যাসটির কাহিনী দুটি খণ্ডে মোট ৩৩টি পরিচ্ছেদ (১১+১২) বিভক্ত। উপন্যাসটির মোট ১৩টি সংস্করণ হয়। ইংরেজি, হিন্দুস্তানী, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষায় এর অনুবাদ হয়।

উপন্যাসটি বাদশা আকবর ও মানসিংহের সমকালীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রচিত রোম্যান্স। রাজা মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ, দুর্গাধিপতি বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা তিলোত্তমা, নবাবনন্দিনী আয়েষা, নবাবের সেনাপতি ওসমান এই চারটি চরিত্রের প্রণয়ের এক জটিল ছবি আঁকার চেষ্টা। পটভূমিতে ইতিহাস থাকলেও ইতিহাসের প্রাধান্য নেই— আবেগও রোমান্সই মুখ্য। অনেক সমালোচক বলতে চান— এটি ওয়ালটার স্কটের 'আইভ্যানহো' উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে রচিত। তবে নিজে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন— 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার আগে তিনি 'আইভ্যানহো' পড়েননি। যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসটিতে তাঁর প্রথম উপন্যাস হিসাবে ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ করা যেতে পারে কিন্তু এটি যে বাংলা উপন্যাসের পথ প্রদর্শক তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কপালকুণ্ডলা: বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত। ৪টি খণ্ড ও ৩১টি পরিচ্ছেদ বিন্যস্ত। প্রথম উপন্যাসের সমস্ত দুর্বলতা, জড়তা কাটিয়ে, ইতিহাসের রোম্যান্সের স্থানে বাস্তবের অনেকটা কাছাকাছি এসেছেন। ইতিহাস পটভূমি হিসাবে আছে ঠিকই কিন্তু সেটাই বড় হয়নি।

উপন্যাসটি রচনার সময়ে তিনি মেদিনীপুরের নেগুয়ায় (বর্তমান কাঁথি) ছিলেন চাকরি-সূত্রে। সেকানে এক কাপালিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং সম্ভবত সেই কাপালিকের কাছে শোনা গল্পই এই উপন্যাসের উৎস। সেই গল্পের সূত্রে লেখকের মনে প্রশ্ন জাগে শিশুকাল থেকে যদি কোনো কনা সমাজ-বিচ্যুত হয়ে কাপালিকের দ্বারা প্রতিপালিত হয় অরণ্যে, সে যদি যৌবনে সমাজে এসেও সমাজকে মানিয়ে নিতে পারবে কিনা। তার উত্তরে তিনি গল্পটি রচনা করেন। অরণ্যে প্রতিপালিত মানুষ কখনোই অরণ্যের চেয়ে সমাজকে বড় বলে বলে ভাবতে পারবে না এবং বনে ফিরে যাবার চেষ্টা করবে।

প্রধান চরিত্র 'কপালকুণ্ডলা'র নামটি ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটক থেকে নেওয়া। চরিত্রটিতে কালিদাসের 'শকুন্তলা' ও শেকস্‌পিয়রের 'মিরান্দার' ছাপ আছে বলে মনে হয়। এখানে 'মতিবিবির উপকাহিনী' আছে, যা মূল কাহিনীর সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশে গেছে। উপন্যাসটিকে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলে অনেকে বিশেষায়িত করেছেন।

উপন্যাসটি ইংরেজি, জার্মান, সংস্কৃত হিন্দি, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এর নাট্যরূপও দেন।

মৃণালিনী : বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস। ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত। ৪টি খণ্ডে মোট ৪৩টি পরিচ্ছেদে কাহিনী বিন্যস্ত। শেষে পরিশিষ্ট যোগ করেছেন। এর গঠনে পূর্ববর্তী উপন্যাস দুটির চেয়ে শিথিলতা লক্ষ করা যায়। অনেকটা আবেগের বশে লেখা। বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়কে লেখক মেনে তিনি পারেননি, বাঙালির শৌর্যবীর্য প্রকাশের দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর শেষের তিন উপন্যাসে যে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, এখানে যেন তারই ইঙ্গিত। ইতিহাসকে প্রেক্ষাপট হিসাবে রাখার জন্য হয়তো প্রথম দুই সংস্করণে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' কথাটি ব্যবহার করেছেন, তৃতীয় সংস্করণ থেকে তা বর্জন করেন। যাই হোক উপন্যাসটি পাঠকসমাজে সমাদর পেলেও শিল্পের বিচারে 'কপালকুণ্ডলা'র

চেয়ে দুর্বল।

বৃষবৃক্ষ : বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্থ উপন্যাস। স্ব-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (বৈশাখ ১২৭৯ সংখ্যা) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে ১২৭৯ (১৮৭২) সালে প্রকাশিত। কাহিনী মোট ৫০টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত, কোনো খণ্ড ভাগ নেই। এর মোট ৮টি সংস্করণ হয়, অষ্টম সংস্করণ, ১৮৯২ সালে।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের ধূসর জগত থেকে বাস্তব সমাজজীবনের কাছে এলেন। সমকালীন বঙ্গদেশের বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতিকে তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু করে তুললেন। 'বিধবা বিবাহ আইন' পাশ হলেও সকলে তা মেনে নিতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্রও পারেননি। আইনের স্বীকৃতি পেলেও নরনারীর মন ও সমাজের স্বীকৃতি না পেলে তা যে সমাজে চলতে পারে না, 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের মুখ্য প্রতিপাদ্য তাই। এই উপন্যাসেই নরনারীর বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম প্রথম স্থান পেল। উপন্যাসে নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর দাম্পত্যজীবনে বিধবা কুন্দনন্দিনীর আগমন সূর্যমুখীর সংসারে ভাঙন ধরিয়েছে। সূর্যমুখী তার স্বামীর কুন্দনন্দিনীর প্রতি অনুরাগ বুঝতে পেরে বিধবা কুন্দের সঙ্গে স্বামীর বিবাহের ব্যবস্থা করে নিজে সংসার ত্যাগ করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় নগেন্দ্রনাথের মনেও বিপর্যয় এসেছে। পরে সূর্যমুখীকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং কুন্দর বিষপানে মৃত্যুর মাধ্যমে সমস্যার সমাধান। এই উপন্যাসে হীরা-দেবেন্দ্রর উপকাহিনী মূল কাহিনীকে পুষ্ট করেছে। সূর্যমুখী-নগেন্দ্র-কমলমণি প্রভৃতি চরিত্র অপেক্ষা উপকাহিনীর হীরা চরিত্রটি জীবন্ত ও উজ্জ্বলতর।

বিভিন্ন ভাষার উপন্যাসটির অনুবাদ হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ইংরেজি, হিন্দি, সুইডিশ প্রভৃতি অনুবাদ। অমৃতলাল বসু এর নাট্যরূপ দেন এবং বহুবার তা অভিনীত হয়।

ইন্দিরা : এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটি একটি দীর্ঘায়তন জটিল উপন্যাসের পর একটু হালকা ধরনের রচনা। এর প্রকাশকাল 'বঙ্গদর্শনে'র চৈত্র ১২৭৯ সংখ্যায়। গ্রন্থাকারে ১৮৭৩ সালে। ১৮৯৩ সালে এর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত। মোট ২২টি পরিচ্ছেদে গল্পটি বিন্যস্ত। নায়িকা ইন্দিরার আত্মকথনে উপন্যাসটি বিবৃত। ধনী ঘরের কন্যা বিবাহের বহুদিন পর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে ডাকাতের হাতে পড়ে এবং বহুকষ্টে কলকাতায় গিয়ে স্বামীর সন্ধান পায়। এর মধ্যে রোম্যান্সের লক্ষণ থাকলেও উনিশ শতকের বঙ্গদেশের নারীর এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে উপন্যাসে বিষয়বস্তুতে চমক ও সাহসের পরিচয়।

ইংরেজি, কানাড়ি প্রভৃতি কয়েকটি ভাষায় উপন্যাসটির অনুবাদ হয়।

যুগলাঙ্গুরীয় : প্রথম প্রকাশ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায়। পুস্তকাকারে ১৮৭৩ সালে। এটিরও পাঁচটি সংস্করণ হয়। মোট ৯টি পরিচ্ছেদে কাহিনী বিবৃত। একে ঠিক উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলা যায় না। বড় আকারের গল্প বলা যেতে পারে। মূলত ২টি আংটি উপলক্ষ্য করে কাহিনীর জটিলতা। গ্রন্থটির একাধিক ইংরেজি অনুবাদ এবং হিন্দি অনুবাদ হয়।

চন্দ্রশেখর : বঙ্কিমচন্দ্রের সপ্তম উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার শ্রাবণ ১২৮০ থেকে ভাদ্র ১২৮১ পর্যন্ত। গ্রন্থাকারে ১৮৭৫-এর তিনটি সংস্করণ হয়। শেষ সংস্করণ ১৮৮৯ সালে। মোট ছটি খণ্ডে

বিভক্ত ও পরিচ্ছেদ সংখ্যা উপক্রমণিকা বাদে ৩৭।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলার সমাজজীবনের ছবি প্রকাশিত। মূল কাহিনী শৈবলিনী-প্রতাপ-চন্দ্রশেখরের। শৈবলিনী বাল্য অবস্থা থেকে পরিণত অবস্থার মানসিক-নৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ লেখকের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকাশিত। শৈবলিনী-প্রতাপের বাল্যপ্রণয় বিবাহে পরিণত হতে পারেনি। চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীর বিবাহ হয় এবং বিবাহোত্তর জীবনে শৈবলিনীর অন্তরে প্রতাপের প্রতি অনুরাগ জীবনে ও সমাজে কতখানি বিপর্যয় ডেকে আনে তা এই উপন্যাসে চিত্রিত। হিন্দুধর্মীয় ও সামাজিক বিধানে এই বিবাহোত্তর প্রণয় অবৈধ ও অনৈতিক তা দেখিয়ে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে স্বামীর কাছে আশ্রয়লাভের বিবরণ এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র শৈবলিনীর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার বিশ্লেষণই এখানে মুখ্য ব্যাপার। এখানে একটি উপকাহিনী আছে— নবাব মীরকাশিম-দলনী বেগমের কাহিনী। সেটি ততখানি উজ্জ্বল নয়— মূল কাহিনীর ঘটনাকালের নির্দেশক হিসাবে কাজ করেছে। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদ ও নীতিবাদ প্রচারের সূচনা। এখানে তাঁর আদর্শপুরুষ হিসাবে প্রতাপ ও চন্দ্রশেখরকে দেখিয়েছেন। উপন্যাসটির তিনটি সংস্করণ হয়। শেষ সংস্করণ ১৮৮৯ সালে। ইংরেজি, তামিল, তেলেগু ভাষায় এর অনুবাদ হয়।

রাধারানী : অষ্টম উপন্যাস রাধারানী 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮২ সালের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত। "উপন্যাস অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস-সংগ্রহ"-এ ১৮৭৭ সালে সন্নিবিষ্ট। ১৮৮৬ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত। এই গ্রন্থটি রচনার ইতিহাস 'বঙ্কিম-জীবনী' থেকে জানা যায়— ১২৮২ সালে গৃহবিগ্রহ রাধাবল্লভজীর রথযাত্রার সময় একটি বালিকা হারিয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে তার আত্মীয়স্বজনের সন্ধানে তৎপর হন। তার মাস ছয়েক পরে 'রাধারানী' লিখিত হয়। কাহিনীটির তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই— সাধারণ গল্পমাত্র। এর দুখানি ইংরেজি অনুবাদ হয়।

রজনী : ১২৮১-৮২ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত। পুস্তকাকারে প্রকাশ ১২৮৪/১৮৭৭ সালে। এর তৃতীয় সংস্করণ ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত। 'বঙ্গদর্শন' থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় প্রচুর পরিবর্তন হয়। মোট ৫টি খণ্ডে ৩২টি পরিচ্ছেদে কাহিনী বিন্যস্ত।

উপন্যাসটির রচনারীতির বিশেষত্ব ও নতুনত্ব লক্ষণীয়। গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তে উপন্যাসটি কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর জবানিতে লেখা। লেখক নিজে স্বীকার করেছেন এই পদ্ধতির কথা এবং বিজ্ঞাপনে সে প্রসঙ্গে লিখেছেন— "উপাখ্যানের অংশবিশেষ, নায়ক বা নায়িকা-বিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা, প্রচলিত রচনা-প্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নতুন নহে। উইল্‌কি কলিন্স-কৃত "woman in white" নামক গ্রন্থ-প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা হয়।" এই উপন্যাসে রজনী, অমরনাথ, শচীন্দ্র, লবঙ্গলতা নিজের মুখে তাদের কথা ব্যক্ত করেছে এবং সকলের বক্তব্যের সম্মিলনে গল্পের প্লট গড়ে উঠেছে। কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র রচনী এক অন্ধ ফুলওয়ালী। এই কাহিনীর প্রেরণা বঙ্কিমচন্দ্র পেয়েছেন লর্ড

লিটনের 'Last Days of Pompeii' নামক উপন্যাসের নিদিয়া নামক এক অন্ধ ফুলওয়ালীর মধ্যে। 'রজনী'কে বাংলায় লেখা প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস বলা যায় অর্থাৎ এই উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর মুখে তাদের মনের সূক্ষ্ম দিকগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে। গ্রন্থটি ইংরেজি এবং গুজরাটিতে অনূদিত হয়েছে।

কৃষ্ণকান্তের উইল : বঙ্কিমচন্দ্রের দশম উপন্যাস। বঙ্গদর্শনের ১২৮২ থেকে ১২৮৪ পর্যন্ত সংখ্যায় উপন্যাসটি প্রকাশিত। পুস্তকাকারে ১২৮৫ বঙ্গাব্দে (১৮৭৮) প্রকাশিত। চতুর্থ সংস্করণ ১৮৯২ সালে। দুটি খণ্ডে মোট ৪৬টি পরিচ্ছেদে এর আখ্যান বিন্যস্ত।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের মতই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বঙ্গদেশের সামাজিক জীবনের চিত্র। বিষবৃক্ষে বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে বিধবার বিবাহ নিয়ে পারিবারিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে আর কৃষ্ণকান্ত উইলে বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে বিধবার বিবাহের আকাঙ্ক্ষায় পারিবারিক সমস্যা তৈরি হয়েছে। দুটি উপন্যাসেই বিবাহিত পুরুষের বিধবা নারীর প্রতি আকর্ষণ পরিবারে ও সমাজে অশুভ পরিণামের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। কৃষ্ণকান্তের উইলে গোবিন্দলালের সংসার ভেঙেছে কামনা-বাসনায় দীপ্ত রোহিনীর জন্য। বিধবা পূর্ণযুবতী রোহিনী সক্রিয় ও জীবন্ত। গোবিন্দলালের হাতেই তার মৃত্যু। এই হত্যা যথাযথ ও শিল্পসম্মত।

গ্রন্থটি ইংরেজি, হিন্দি, তেলেগু, কন্নড় প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়।

রাজসিংহ : বঙ্কিমচন্দ্রের একাদশ উপন্যাস। বঙ্গদর্শনে চৈত্র ১২৮৪ থেকে ভাদ্র ১২৮৫ পর্যন্ত প্রকাশিত। এর চতুর্থ সংস্করণ ১৮৯৩ সালে। এই সংস্করণে এর আয়তন প্রায় ৫ গুণ বেড়ে ৮৩ থেকে ৪৩৪ হয়। শেষ সংস্করণ অনুসারে এর খণ্ড সংক্যা-৮ এবং পরিচ্ছেদ সংখ্যা ৬৪।

এটিই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য অনেক উপন্যাসে ইতিহাস থাকলেও তা ঐতিহাসিক হয়ে ওঠেনি। লেখক নিজেই উপন্যাসের ভূমিকায় বলেছেন— "আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।" এখানে ঔরঙ্গজেব ও রাণা রাজসিংহের সংগ্রাম প্রধান বিষয়। রাজসিংহের বিক্রম ও বীরত্বই বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য। মূল কাহিনীর সঙ্গে লেখক পার্শ্বকাহিনী যোগ করেছেন দুটি— মানিকলাল-নির্মলকুমারী এবং জেবউন্নিসা-মরারকের কাহিনী। আকার-আয়তনে এটি বঙ্কিমচন্দ্রের বৃহত্তম উপন্যাস। উপন্যাসটির গথিক প্লট অর্থাৎ হর্ম্যাকার প্লট উপন্যাসটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

আনন্দমঠ : বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বাদশ উপন্যাস। বঙ্গদর্শনে চৈত্র ১২৮৭ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ পর্যন্ত প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে ১২৮৯ বঙ্গাব্দে (১৮৮২) প্রকাশিত। পঞ্চম সংস্করণ ১৮৯২-এর কাহিনী অষ্টদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলাদেশের। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় বঙ্গের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে 'আনন্দমঠ' রচিত। মোট ৫ খণ্ডে ৪৬টি পরিচ্ছেদে কাহিনী বিন্যস্ত।

এই উপন্যাসে বাঙালির শৌর্যবীর্যকে মহৎ আদর্শ-দেশপ্রেম ও নিষ্কামধর্মের সমন্বয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে দেশমাতৃকার কল্পনা এবং বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি ব্যবহৃত হয়েছে।

দেশী-বিদেশী বহুভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ হয়েছে।

দেবী চৌধুরানী : বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়োদশ উপন্যাস। ১২৮৯ সালে অংশত বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে ১২৯১ বঙ্গাব্দে (১৮৮৪)। ষষ্ঠ সংস্করণ ১৮৯১। তিনটি খণ্ডে ৪২টি পরিচ্ছেদে কাহিনী বিন্যস্ত।

'আনন্দমঠ'-এ যে নিষ্কামতত্ত্ব ও আদর্শবাদের সঙ্গে দেশাত্মবোধ দেখা গেছে, দেবী চৌধুরানীতে প্রফুল্লের মাধ্যমে সেই আদর্শকে গার্হস্থ্য ও সাংসারিক জীবনের সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছে। সামাজিক জীবনে পুরুষের বহুবিবাহ, সামাজিক বিধিনিষেধের জালে জর্জরিত প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের সান্নিধ্যে এসে প্রতিবাদী চরিত্র হয়ে উঠেছে। গীতার আদর্শে সংসারে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা এখানে প্রদর্শিত।

কানাড়ী ও তেলেগুতে এর অনুবাদ হয়। 'দেবী চন্দ্রপ্রভা' নামে তামিল অনুবাদও হয়।

সীতারাম : বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্দশ তথা শেষ উপন্যাস সীতারাম। 'প্রচার' পত্রিকায় ১২৯১ থেকে ১২৯৩ পর্যন্ত প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে ১৮৮৭ সালে প্রকাশ। এর তিনটি খণ্ড ও ৫৫টি পরিচ্ছেদ। তিনটি সংস্করণ হয়।

আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরানীর মত এখানেও অনুশীলন তত্ত্ব প্রচারের প্রয়াস লক্ষণীয়। গ্রন্থারম্ভে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করার মধ্যেই এই প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসের মাধ্যমে হিন্দুধর্ম ও সাম্রাজ্যের প্রসারের কল্পনা রূপায়িত হয়েছে। 'প্রচার' পত্রিকাতেই এই উপন্যাসের সঙ্গেই প্রকাশিত হয়েছে 'বাঙ্গালার কলঙ্ক', 'হিন্দুধর্ম' নামে দুটি রচনা। তা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের তৎকালীন চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও তার মধ্যে ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয়নি। লেখক নিজেই প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তা জানান— "সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা হয় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনটি উপনাস তত্ত্ব ও আদর্শমূলক। গীতার আদর্শবাদ ও নৈতিকতার প্রচারই যেন মুখ্য হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের সপ্তম-অষ্টম দশকে বাঙালির মধ্যে স্বাদেশিকতা বোধ জাগতে আরম্ভ করে, বলা যায় প্রবলভাবেই। 'আনন্দমঠ'কে স্বদেশ প্রেমমূলক উপন্যাসই বলা যায়। একসময় স্বদেশকর্মীদের এক হাতে গীতা, অন্য হাতে আনন্দমঠ থাকত। তবে উপন্যাসে হিসাবে সার্থক হয়েছে একথা বলা যায়।

সবশেষে বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাস বিশেষ স্থানে উন্নীত হয়। তিনি ইতিহাস আশ্রিত রোমান্স, সামাজিক, ঐতিহাসিক, স্বদেশপ্রেমমূলক উপন্যাস, আত্মকথন ধর্মী উপন্যাস, মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস প্রভৃতি ধরনের উপন্যাস রচনা করেছেন। সর্বোপরি তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে অনেক নতুন ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেন। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকবৃন্দ বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম পর্বের উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষণীয়।

একক ২১ ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

বঙ্কিম-পরবর্তীকালে যে-সব ঔপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ্য। মোট ১৩টি উপন্যাস রচনা করেছেন তিনি। উনিশ শতকের শেষে, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে রচিত উপন্যাস ৩টি— 'করুণা', 'বউ ঠাকুরানির হাট' ও 'রাজর্ষি'। এই রচনাগুলি মূলত বঙ্কিমচন্দ্রের ধারার অনুসারী ঘটনাপ্রধান উপন্যাস। এই তিনটি উপন্যাস রচনার পর অর্থাৎ ১৮৮৭ সালের পর ১৯০১ সালে 'চোখের বালি' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘকাল কোনো উপন্যাস লেখেননি। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি অনেক গল্প রচনা করেন। 'চোখের বালি' থেকে 'চার অধ্যায়' এই ১০টি উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করার সময় বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ রচনার ক্ষেত্রে আঙ্গিক নিয়ে নানা পরীক্ষা করেছেন, একই আঙ্গিকে একাধিক উপন্যাস লেখেননি। এখন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির পরিচয় নেওয়া যাক।

করুণা : রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস ১৬ বছর বয়সে লেখা 'করুণা' উপন্যাস। 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৪-৮৫ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর গল্পগুচ্ছ ৪র্থ খণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। শিল্প হিসাবে ততখানি সার্থক নয়। বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রভাবে লেখা। তবে উপন্যাস রচনার প্রয়াস হিসাবে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। তাঁর পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলির বীজ এখানেই নিহিত। শিল্পগত দিক দিয়ে সার্থক না হলেও, এখানে লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির আভাস লক্ষ করা হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ নিজে 'করুণা'কে গুরুত্ব দিতে চাননি। 'জীবনস্মৃতি'র খসড়ায় তিনি বইটি সম্পর্কে লিখেছেন— "জ্যাঠামির পরিচয়"।

বউ ঠাকুরানীর হাট : দ্বিতীয় উপন্যাস। 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৮-৮৯ বঙ্গাব্দে এবং গ্রন্থকারে ১২৮৯ বঙ্গাব্দে (১৮৮৩) প্রকাশিত। উপন্যাসটিতে বাংলার রাজা প্রতাপাদিত্য ও তাঁর পরিবারের কাহিনী বর্জিত। উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্যর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের ছাপ আছে। উপন্যাসটিতে প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' গ্রন্থের প্রভাব পড়েছে বলে সমালোচকগণ মনে করেন।

রাজর্ষি : রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় উপন্যাস। 'বালক' পত্রিকার আষাঢ় ১২৯২ থেকে মাঘ ১২৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে ১২৯৩ বঙ্গাব্দে (১৮৮৭) প্রকাশিত। এখানে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের ইতিহাস স্থান পেয়েছে। স্বপ্নে দেখা একটি ঘটনার সঙ্গে ত্রিপুরার রাজপরিবারের কাহিনী মিশিয়ে উপন্যাসটি রচনা করেন। এই উপন্যাসের অংশবিশেষ নিয়ে পরে 'বিসর্জন' নাটক লেখেন। রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের জীবপ্রেমের সঙ্গে ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির প্রথানুসরণের দ্বন্দ্বই মূল বিষয়, তার সঙ্গে রাজভ্রাতা নক্ষত্রমাণিক্যের সিংহাসন লাভের চেষ্টা যুক্ত হয়েছে। এই উপন্যাসের পর দীর্ঘকাল আর উপন্যাস লেখেননি।

চোখের বালি : চতুর্থ উপন্যাস 'চোখের বালি', 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) পত্রিকায় ১৩০৮-৯ সালে প্রথম প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে। এক নতুন ধরনের উপন্যাস। শুধু ঘটনা পরম্পরার বিবরণ নয়, নরনারীর অন্তরের কথা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে এই উপন্যাসে। যদিও এই মনের কথা বিশ্লেষণ করার রীতি বাংলা সাহিত্যে প্রথম লক্ষ করা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' ও স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে?' উপন্যাসে। তবে রবীন্দ্রনাথই এই উপন্যাসে সার্থকভাবে এই রীতির প্রয়োগ করেন। এখানেও বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলের মতো বাঙালি বাল্যবিধবাদের সমস্যা মূল প্রতিপাদ্য। মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য জীবনে বিধবা বিনোদিনীকে নিয়ে জটিলতা। তবে সমাধানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মৃত্যুকে আনেননি, তিনি বিনোদিনীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন।

নৌকাডুবি : নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (১৩১০-১২) প্রকাশিত এবং গ্রন্থাকারে ১৩১৩ সালে। সামাজিক জীবন-সমস্যা এর মূল বিষয়। পূর্ববর্তী 'চোখের বালি' ও পরবর্তী 'গোরা' উপন্যাসের মাঝখানে রচিত উপন্যাসটি যেন কিছুটা শিথিলবদ্ধ। তাই সমালোচকগণ একটু অন্যদৃষ্টিতে দেখেন। পূর্ব ও পরের দুই উপন্যাসের মনোবিশ্লেষণ ও মহাকাব্যধর্মিতার মাঝে একে আপাতদৃষ্টিতে খাপছাড়া বলা যায়। কিন্তু এটি উপন্যাস হিসাবে অপাংক্তেয় নয়, লেখক নিজে এ উপন্যাস সম্পর্কে 'করুণা'র মতো কোনো বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেননি। বরং এই কাহিনীর পরিশিষ্টরূপে লিখিত হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'নৌকাডুবির পরে' নামক গ্রন্থের সংশোধন ও পরিমার্জনা করেন।

গোরা : রবীন্দ্রনাথের বৃহদায়তন ও ভাবেভাবনায় মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস 'গোরা'। প্রবাসী পত্রিকার ভাদ্র ১৩১৪ থেকে ফাল্গুন ১৩১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। ভারতবর্ষের অন্তরাত্মাকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন লেখক। ভারতবর্ষ মহামানবের আশ্রয়স্থল। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ এসেছে এবং তারা ভারতমাতার সন্তান হিসাবে পরিচিত হয়েছে। নায়ক গোরা অনাথ আইরিশ সন্তান হিন্দু ব্রাহ্মণ রমণীর কোলে মানুষ হয়ে হিন্দুত্বের জয়গান করেছে কিন্তু সে যেদিন জানতে পারে সে হিন্দু নয়, সেদিন তার কাছে সমস্ত হিন্দুমন্দিরের দ্বার তার সামনে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সে ভারতমাতার প্রতিভূ আনন্দময়ীর কোলে আশ্রয় পায়। এটাই হিন্দু ভারতের বিশেষত্ব। গোরা উপন্যাসে নতুন করে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করা হয়েছে।

চতুরঙ্গ : রবীন্দ্রনাথের সপ্তম উপন্যাস চতুরঙ্গ (চতুঃ + অঙ্গ) অর্থাৎ চার অঙ্গ। 'সবুজ পত্র' পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দে চারটি সংখ্যায় চারটি অঙ্গ—জ্যাঠামশায়, শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাস যেন চারটি পৃথক গল্প। স্বতন্ত্র গল্পরূপেই প্রকাশিত। তাই উপন্যাসটির গঠনেও বিশেষত্ব; চারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পের সাহায্যে একটি প্লট রচিত হয়েছে। আঙ্গিকে দিক থেকেও উপন্যাসটিকে নতুন বলা যায়। এই উপন্যাসেই 'চেতনাপ্রবাহরীতি মূলক' উপন্যাসের লক্ষণ প্রথম দেখা যায়।

ঘরে-বাইরে : রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও রাজনীতি ভাবনার পরিচয় দুটি উপন্যাসে পাওয়া যায়,

'ঘরে-বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়ে'। ঘরে-বাইরে 'সবুজ পত্র' পত্রিকার ১৩২২ সালে প্রকাশ পায়। গ্রন্থাকারে ১৯১৬ সালে। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঘরের নারীদের বাইরের জগতে এনে সমাজ ও দেশের সর্বাঙ্গীন সঙ্গী হিসাবে দেখার চেষ্টা করেছেন। ঘরের বধূ বিমলাকে বাইরের স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছে স্বামী নিখিলেশ। আর সেই সত্রেই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে উদারতার পরিবর্তে যে সংকীর্ণতা আছে তার মুখোশ খুলে যায়। এখানে গল্প বলার ভঙ্গী আত্মকথনধর্মী—বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপ তিনজনেই আত্মকথা লিখেছে এবং এই তিনজনের আত্মকথা গল্পটির নিটোল রূপ তৈরি করেছে। ভাষার দিক থেকে লক্ষণীয়, এখানে চলিত গদ্যরীতির ব্যবহার। নিখিলেশের চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের জীবনের ছাপ স্পষ্ট, বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে।

যোগাযোগ : উপন্যাসটি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৪-৩৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে ১৯২৯ সালে। পত্রিকায় প্রকাশের সময় প্রথম দুটি সংখ্যায় নাম ছিল 'তিনপুরুষ'। তৃতীয় সংখ্যা থেকে নাম পরিবর্তন করেন। লেখকের ইচ্ছা ছিল কাহিনীসূত্র তৃতীয় পুরুষ পর্যন্ত টানবেন কিন্তু তৃতীয় পুরুষকে না এনেই, তার জন্মের সম্ভাবনা দেখিয়েই সমাপ্তি। তাই হয়তো নাম বদল। অবশ্য অন্য একটি কারণের কথাও বলেন সমালোচকগণ তা হল— ইতিমধ্যে 'তিনপুরুষ' নামে জলধর সেনের একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়, সেই কারণে নামবদল করা হয়। এই উপন্যাসে গার্হস্থ্যজীবনের সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই নতুন জীবন তথা যুগ পরিবর্তনের ভাবনা উন্মোচিত। আর বাঙালির জমিদারী, ব্যবসা ও আভিজাত্যের ছবি, দ্বিতীয়ত নারীর স্বাতন্ত্রবোধ ও বিবাহ সমস্যা, দাম্পত্যজীবনের সমস্যাই লেখক এখানে দেখিয়েছেন।

শেষের কবিতা : রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস 'শেষের কবিতা'। 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে ১৯২৮ সালে। এখানে রবীন্দ্রনাথ সমাজ-রাজনীতি দূরে সরিয়ে নরনারীর নির্মম প্রেমের গল্প লিখলেন লেখক। রবীন্দ্র-উপন্যাসের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাসটি সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছেন— "'শেষের কবিতা' যেন উপন্যাস ও কবিতার জড়োয়া শিল্প।" [দ্র. 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', রবীন্দ্রনাথ খণ্ড, ২৫শ পরিচ্ছেদ] এই উপন্যাসে অমিত-লাবণ্যের ভালবাসার স্বরূপ প্রদর্শিত হলেও, সমকালীন রবীন্দ্র-বিরোধিতার চিত্রটিও নিপুণভাবে এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ।

'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' : উপন্যাস দুটি আকার-আয়তনে ছোট। প্রায় একই সময়ে লিখিত ও প্রকাশিত— 'দুইবোন' প্রকাশ পায় 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন সংখ্যায় এবং 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালের আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। গ্রন্থাকারে দুইবোন ১৩৩৯ সালে আর মালঞ্চ ১৩৪০ সালের চৈত্র মাসে। দুটি উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথের নারী-ভাবনার পরিচয় বিধৃত। 'দুইবোন' উপন্যাসের শুরুতেই মেয়েদের শ্রেণীবিচার— "এক জাত প্রধানত মা, আর একজাত প্রিয়া।" উপন্যাসটির আলোচনায় লেখক বলেছেন— "সাধারণত মেয়েরা পুরুষের সম্বন্ধে কেউ মা, কেউ-বা প্রিয়া, কেউ-বা দুইয়ের মিশোল।" 'দুইবোন' উপন্যাসে শর্মিলা মায়ের জাত, সে তার স্বামীকে মায়ের দৃষ্টি দিয়ে বেষ্টন

করে রাখতে চায়। 'মালঞ্চে' ঠিক বিপরীত ছবি, এখানে নীরজা মায়ের জাত নয়, প্রিয়ার জাত। দুই উপন্যাসে নারীর দুই রূপের পরিচয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত।

চার অধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়'। এটি ১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে একেবারেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। এখানে 'ঘরে-বাইরে'র মতো সমকালীন রাজনীতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না থাকলেও, তা প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান। অসহযোগ আন্দোলনের পর যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু হয় সেই পরিপ্রেক্ষিতই 'চার অধ্যায়'-এ পাই। এই আন্দোলনে হঠকারিতার পরিণতির কথাও রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। এলা ও অতীন্দ্র দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের মিলনের আশা দূরে ঠেলে দিয়ে একজন নিজের পণকে আর একজন নিজের আত্মমর্যাদাবোধকে আঁকড়ে ধরে শেষে আত্মবলি দিল।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত কবি হলেও সাহিত্যের সমস্ত শাখায় বিচরণ করেছেন। গল্প উপন্যাস রচনাতেও তিনি তুলনাহীন। উপন্যাস সাহিত্য ও গল্পসাহিত্যে তাঁর দান অবশ্য স্বীকার্য। ১৬ বছর বয়সে উপন্যাস রচনার সূত্রপাত এবং ৭৭ বছর বয়স পর্যন্ত তার ব্যাপ্তি। বিভিন্ন আঙ্গিক, বিভিন্ন ধরনের মোট ১৩টি উপন্যাস রচনা করে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

একক ২২ ❑ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

ভূমিকা : বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা উপন্যাসে যিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে, তিনি হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের জনপ্রিয়তা থাকলেও সেগুলি সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কারণ সেখানে চরিত্রগুলি মূলত উচ্চশ্রেণীর এবং সেখানে নাগরিক জীবনের সমস্যাই প্রকাশিত। এই অবস্থায় শরৎচন্দ্র এলেন ঘরের কথা, সাধারণের কথা, নারীদের কথা, পারিবারিক জীবন ও সমস্যার কথা নিয়ে। আবেগময় ভাষাভঙ্গীতে তার প্রকাশ পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করেছিল। বিষয়বস্তু ও আবেগ বাংলাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের আনন্দ-বেদনার সার্থক রূপকার শরৎচন্দ্র। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' (১৯১৩) এবং শেষ উপন্যাস 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫) ও মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'শুভদা' ও 'শেষের পরিচয়' পর্যন্ত প্রায় ত্রিশটি ছোটবড়ো উপন্যাসে তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে।

উপন্যাসসমূহ : তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলির প্রকাশকালের বিচারে কালানুক্রমিক তালিকা— 'বড়দিদি' (১৯১৩), 'বিরাজবৌ' (১৯১৪), 'পরিণীতা' (১৯১৪), 'পণ্ডিতমশাই' (১৯১৪), 'মেজদিদি' (১৯১৫), 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬), 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৯১৬), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), 'শ্রীকান্ত' (চার পর্ব— ১৯১৭, ১৯১৮, ১৯২৭, ১৯৩৩), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'স্বামী' (১৯১৮), 'দত্তা' (১৯১৮), 'ছবি' (১৯২০), 'গৃহদাহ' (১৯২০), 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০), 'দেনাপাওনা' (১৯২৩), 'নববিধান' (১৯২৪), 'পথেরদাবী' (১৯২৬), 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫)। মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'শুভদা' (১৯৩৮), তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাস 'শেষের পরিচয়' সমাপ্ত করেন রাধারানী দেবী।

এই উপন্যাসগুলির বিভিন্নজনে বিভিন্ন ভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছেন— কেউ বিষয়ভিত্তিক, কেউ রচনারীতিভিত্তিক ইত্যাদি ভাগে ভাগ করেছেন। এই শ্রেণীবিভাগের আগে অন্য একটি প্রসঙ্গে আসা যাক। শরৎচন্দ্রের রচনায় দুই প্রভাবশালী সাহিত্যিক পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্র ও সমকালীন রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তবে বঙ্কিম অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

তাঁর বঙ্কিম-প্রভাবিত রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'দেবদাস', 'পরিণীতা', 'বিরাজ-বৌ', 'পল্লীসমাজ', 'দত্তা', 'দেনাপাওনা', 'পথের দাবী' প্রভৃতি। উপন্যাসগুলির আখ্যানে সমস্যা ও সমাধানে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ লক্ষণীয়। দেবদাস ও পল্লীসমাজে বাল্যপ্রণয়জনিত সমস্যা 'রজনী' ও 'চন্দ্রশেখর'-এর কথা স্মরণ করায়। চন্দ্রনাথে বঙ্কিমের 'ইন্দিরা'র ছায়া স্পষ্ট— পাচিকাবেশে স্বামী মিলন বিষয়টি লক্ষণীয়। আবার 'আনন্দমঠে'র ছায়া 'পথের দাবী'র উপর পড়েছে।

শরৎচন্দ্রের যে-সব রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'মন্দির', 'বড়দিদি', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'বিপ্রদাস', 'অরক্ষণীয়া' প্রভৃতি। গৃহদাহে 'চোখের বালি'র ছাপ আছে। 'গোরা', 'নৌকাডুবি'রও ছাপ স্পষ্ট বিশেষত হিন্দু-ব্রাহ্মের বিরোধের চিত্রাঙ্কনে।

বিষয়গত বিচারে শরৎচন্দ্রের রচনাকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। এপ্রসঙ্গে একটি কথা বলতে হয় শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত রচনাই পরিবারকে কেন্দ্র করে সামাজিক সমস্যামূলক। বিষয়গত দিক থেকে চারটি ভাগ:

১. **পারিবারিক স্বার্থবোধজনিত সমস্যার কাহিনী :** বিন্দুর ছেলে, পরিণীতা, বিরাজ-বৌ, পণ্ডিতমশাই, মেজদিদি, রামের সুমতি, নিষ্কৃতি, বৈকুণ্ঠের উইল প্রভৃতি। আমাদের অতি পরিচিত পরিবারের সুখ-দুঃখ- ভালবাসার দৈনন্দিন জীবনের ছবি মরমী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসেই উঠে এসেছে, তাই পাঠক ঘরের কথাকে পেয়ে উদ্বেল হয়েছে। তাঁর ক্ষুদ্রাকার দুই উপন্যাস বৈকুণ্ঠের উইল, পণ্ডিতমশাই-এর নাম প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে। পণ্ডিতমশাই-এ বৃন্দাবন ও কুসুমের সম্পর্কে মধ্যে প্রধান বাধা পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার। কুসুমের পক্ষে বাধা তার বৈধব্যের সংস্কার, অন্যদিকে বৃন্দাবনের ক্ষেত্রে মায়ের অপমান। বৈকুণ্ঠের উইলে দেখি ভ্রাতৃস্নেহের চূড়ান্ত রূপ।

২. **নরনারীর সমাজ-নিষিদ্ধ প্রণয়ের কথা :** বড়দিদি, দেবদাস, পল্লীসমাজ, চন্দ্রনাথ, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, দেনাপাওনা প্রভৃতি। দেবদাস শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির অন্যতম। এখানে বঙ্কিমের অনুসরণ লক্ষণীয়। এখানে পার্বতী-দেবদাসের বাল্যপ্রণয় চন্দ্রশেখরের প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয় স্মরণ করায়। আর শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট উপন্যাস 'চরিত্রহীন'। সেই সময়ে লেখকের খ্যাতি-অখ্যাতির অনেকটাই নির্ভর করছিল উপন্যাসটির উপর। এই উপন্যাসে 'চোখের বালি'র প্রভাব চোখে পড়ে। চোখের বালির আদর্শে কিরণময়ীর পরিকল্পনা বলে মনে হয়। চরিত্রহীন-এর প্লট খুব একটা গোছানো নয়। দুটি পাশাপাশি চলা কাহিনীর সাবিত্রী ও কিরণময়ীর ততখানি মিল হয়নি। গৃহদাহের প্লট অনেকটা স্পষ্ট— এখানেও চোখের বালির ছাপ দেখা যায়। দেনা-পাওনা শরৎচন্দ্রের এক জটিল উপন্যাস। নায়ক জীবানন্দ এক ব্যতিক্রমী চরিত্র— একজন মানুষ সম্পর্কে পাপাচারী, দুর্বৃত্ত প্রভৃতি যত খারাপ কথাই বলা যায় তা যেন এরপক্ষে যথেষ্ট নয়। তার বিবাহিত পরিত্যক্ত স্ত্রী এখন ভৈরবী। এই ভৈরবীর প্রতি আকর্ষণ ও পুনরায় সংসারে প্রবেশের বাসনা কীভাবে জাগল তাই এখানে দেখানো হয়েছে।

৩. **আত্মকথামূলক :** শ্রীকান্ত (চারটি পর্ব)। লেখকের আত্মকথামূলক উপন্যাস চারটি পর্বে প্রকাশিত। প্রথম পর্বে বাল্যজীবনের কথা, দ্বিতীয় পর্বে বর্মা প্রবাসের কাহিনী, আর তৃতীয়-চতুর্থ পর্বে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ দেখা যায়। এই উপন্যাসের প্লটে শিথিলতা, উপন্যাসের সংহত রূপ এই প্লটে নেই। অবশ্য উপন্যাসের পন্থাকার প্লটে সেটা ততখানি পাওয়া যায় না। অবশ্য দীর্ঘকাল ধরে খণ্ডে খণ্ডে রচনাও প্রকাশ করার জন্য প্লটের সংহতি নষ্ট হয়েছে।

৪. **রাজনৈতিক চেতনামূলক :** পথের দাবী। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ ভারত ভূখণ্ডের

বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল, ব্রহ্মদেশে। এখানে তার ছবি পাই। তবে উপন্যাসটিতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ থাকলেও রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে ওঠেনি, রাজনীতিকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে অপূর্ব-ভারতীয় প্রেম। এখানে "সব্যসাচীর কোমলগম্ভীর রোম্যান্টিক ভূমিকাই পথের দাবীর জনপ্রিয়তার হেতু। আসলে কিন্তু বিপ্লব-পন্থার ইতিহাস-চিত্র হিসাবে পথের দাবী খুব সার্থক নয়।" 'শেষ প্রশ্নে'ও রাজনীতি আছে তবে তা তত্ত্বমূলক। বিতর্কিত ও ব্যতিক্রমী উপন্যাস হিসাবেও তাৎপর্যপূর্ণ এই উপন্যাসটি।

উপসংহার : বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের সর্বাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির পরিমণ্ডলে কুণ্ডলীন পুরস্কারের জন্য মনোনীত 'মন্দির' গল্প দিয়ে যার সূচনা, অসমাপ্ত উপন্যাস 'শেষের পরিচয়ে' তার সমাপ্তি। সহজ সরল আবেগময় ভাষায় আমাদের ঘরের কথাকে, মনের কথাকে প্রকাশ সরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব। প্রায় ত্রিশখানি উপন্যাসের সবগুলিই যে সার্থক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ তা নয়। তবে বেশ কয়েকটি উপন্যাসে তিনি জনপ্রিয়তার শিখরে বসে আছেন।

একক ২৩ ❑ অন্যান্য ঔপন্যাসিক

২৩.১ ভূমিকা/প্রস্তাবনা

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে হতাশা নৈরাজ্য, অবিশ্বাস মানবজীবনের দিক পরিবর্তন সূচিত করে। বাংলাতেও রাজধানী স্থানান্তর (১৯১১) বাঙালি মনে অস্থিরতা, হতাশা জাগিয়ে তুলেছিল। এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার যুগে নবীন কিছু লেখকের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের দিক পরিবর্তন সূচিত করে। বিশেষ করে কল্লোল গোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভেঙে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছিল। কাব্য-কবিতা-কথাসাহিত্যে রবীন্দ্র বিরোধিতাও প্রবল হয়ে উঠেছিল। 'সবুজ পত্র' পত্রিকাও নতুনত্বের ডাক দিল। ঠিক এই সময়েই বাংলা উপন্যাস ও গল্পে নবীন লেখকের আবির্ভাব ঘটল। তাঁদের মধ্যে বন্দ্যোপাধ্যায়-ত্রয়ী (বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক), প্রেমেন্দ্র মিত্র, সতীনাথ ভাদুড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য। আর এক ঔপন্যাসিকের নাম করা যায়— তিনি অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তিনি আঞ্চলিক উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন। এই পর্বে তিনিও আলোচিত।

২৩.২ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যে যে নতুনত্বের সূচনা হয়, সেখানে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক) ভূমিকা কম নয়। তিনজনের বিশেষত্ব বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করল।

এঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ ঘরের কথাকে, সাধারণ পল্লীর মানুষের কথাকে বিশ্বপ্রকৃতির প্রেক্ষাপটে এনে দাঁড় করালেন। তাঁর অনুভূতিতে কবির কাব্যময়তা বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রগাঢ় অনুভূতি ও আবেগময়তায় তাঁর আখ্যানগুলি রমণীয় হয়ে উঠেছে।

তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল— 'অপরাজিত' (১৯৩২), 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫), 'আরণ্যক' (১৯৩৮), 'বিপিনের সংসার' (১৯৪১), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪৩), 'দেবযান' (১৯৪৪), 'ইছামতী' (১৯৪৯) প্রভৃতি।

বিভূতিভূষণের রচনায় বঙ্গদেশ ও ভারতের কথা উঠে এসেছে আটপৌরে ভঙ্গিমায়। উপন্যাস কাঠামোয় তাঁর কবিচেতনা আমাদের অপার রহস্যলোকে পৌঁছে দেয়। মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় ঘনিষ্ঠতার কথাই তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে।

২৩.৩ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ও স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কর্ণধার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বীরভূমের মানুষ। রাঢ়বঙ্গের মাটি ও মানুষ তাঁর গল্প ও উপন্যাসের উপাদান। বীরভূম ও সন্নিহিত অঞ্চলের মানুষের সার্বিক বিশেষত্ব নিয়ে তারাশঙ্করের আবির্ভাব। অনেকে তাঁকে বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের পথিকৃৎ বলতে চেয়েছেন। তাঁর 'কালিন্দী', 'কবি', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা' প্রভৃতি উপন্যাসে

বীরভূমের গ্রামজীবন নিখুঁতভাবে প্রকাশিত। এছাড়াও রাঢ়ের বৈষ্ণব সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র, ক্ষয়িষ্ণু জমিদার প্রথার অবক্ষয়ের ছবি তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। তিনি নিজে জমিদার বংশের সন্তান হওয়ায় এই ছবি আঁকা সহজ হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের ক্ষয় ও বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে নতুন কালের আবির্ভাব ও দ্বন্দ্ব সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে তাঁর রচনায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিও তাঁর রচনার অন্যতম বিশেষত্ব।

এই সমস্ত কিছুর উপর ভিত্তি করে প্রচুর উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯৩১), 'পাষাণপুরী' (১৯৩৩), 'রাইকমল' (১৯৩৫), 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭), 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫২), 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫২), 'রাধা' (১৯৫৭), 'মঞ্জরী অপেরা' প্রভৃতি তাঁর প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাস।

তারাশঙ্করের রচনার অধিকাংশের প্রেক্ষাপট বীরভূম ও সংলগ্ন রাঢ় অঞ্চল সেখানকার জনমানুষসমেত। ক্ষয়িষ্ণুবৈষ্ণব সমাজ, সামন্ততন্ত্রের ছবি ও নতুন যুগের সঙ্গে তার সংঘাত তারাশঙ্করের রচনায় পরিস্ফুট।

২৩.৪ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬)

বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ীর রচনাবৈশিষ্ট্যে একজনের নিসর্গপ্রীতি, একজনে অঞ্চলপ্রীতি আর তৃতীয় ব্যক্তির রচনায় বস্তুবাদী নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই তৃতীয় ব্যক্তি হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা শুরু করেন। তারও পরে তাঁর রচনায় যথাস্থিতবাদ বা ন্যাচারালিজম্-এর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

তাঁর লেখা উপন্যাসের সংখ্যা কম। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত 'জননী' এবং 'দিবারাত্রির কাব্য', ১৯৩৬ সালে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি' লিখেই তিনি সাহিত্যজগতে ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁর লেখা অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল— 'শহরতলী'-২খণ্ড (১৯৪০, ৪১), 'শহরবাসের ইতিকথা' (১৯৪৬), 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮), 'অহিংসা' (১৯৪৮), 'সোনার চেয়ে দামী' (১৯৫১) প্রভৃতি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় ব্যক্তি ও ব্যষ্টিকে এক অভিনব দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। তাঁর রচনায় ঝোঁক দেখা যায় যৌনতা ও ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্বের দিকে। ক্ষুধা ও রিরংসা এই দুই আদিম প্রবৃত্তির কথা বিধৃত তাঁর রচনায়। তাঁর যৌনচেতনামূলক উপন্যাস 'চতুষ্কোণ'। 'পদ্মানদীর মাঝি' তাঁর লেখা আঞ্চলিক উপন্যাস।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমকালীন অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে থেকেও নিজস্বতায় তিনি সবার থেকে পৃথক। তাঁর লেখায় যৌনতা, ফ্রয়েডীয় চিন্তাভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আঞ্চলিক উপন্যাস রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। মার্কসীয় চিন্তা ভাবনার পরিচয়ও তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। অবশ্য তাঁর রচনার শেষের দিকে যথাস্থিতবাদ বা ন্যাচারালিজমের দিকে প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

২৩.৫ সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-৬৫)

বাংলা সাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর আবির্ভাব ১৯৪৫ সালে জাগরী উপন্যাসের মাধ্যমে। পরবর্তী উপন্যাস দুই খণ্ডে 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' (১৯৪৯, ৫১) এই দুটি উপন্যাসে সতীনাথ বাঙালি পাঠক সমাজের কাছে পরিচিত হলেন। সতীনাথ মূলত প্রবাসী বাঙালি-বিহারের বিভিন্ন স্থানে থেকেছেন, তাই তাঁর রচনায় বাংলা নয় বিহারের মানুষের ছবি, ভাষায় ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সতীনাথ সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাই তাঁর রচনায় রাজনীতিক বিষয়ই প্রাধান্য পেয়েছে।

সতীনাথের প্রথম উপন্যাস 'জাগরী'। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লেখা। আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য 'জাগরী'র বিশু চরিত্রটির ফাঁসির আদেশ হয়। সেই ফাঁসির বন্দীর বিশেষ সেল-এর অভিজ্ঞতা বিশু, বিলুর মা-বাব ও ভাইয়ের জবানিতে ফাঁসি সেল, আপার ডিভিশন ওয়ার্ড, আওরৎ ফিতা এবং জেল গেট— এই চারটি অধ্যায়ে কাহিনী বর্ণিত। বাংলা সাহিত্যে এটিকে 'কারা' উপন্যাস বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে এটিই একমাত্র 'কারা উপন্যাস'। তারপর আর একটি রাজনৈতিক উপন্যাস লেখেন— 'চিত্রগুপ্তের ফাইল'। তার দুখণ্ডে লেখা 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' (১৯৪৯-৫১) সর্ববৃহৎ উপন্যাস। ঘটনার পটভূমি বিহারের জিরানিয়া গ্রাম। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক, সামাজিক প্রেক্ষিতে, স্থানীয় ভাষার সংলাপে কাহিনীর বিন্যাস। গান্ধীজির রাজনৈতিক আন্দোলনে ঢোঁড়াই কীভাবে জড়িয়ে পড়ে এবং তার পরিণতি কাহিনীর মুখ্য প্রতিপাদ্য। রামচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে রচিত তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'-এর আদলে রচিত উপন্যাসটি তাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

সতীনাথের শেষ দিকের তিনটি উপন্যাস মনস্তাত্ত্বিক— 'অচিনরাগিনী', 'সংকট' ও 'দিগ্‌ভ্রান্ত'। সতীনাথ সংখ্যায় কম উপন্যাস লিখলেও তাঁর উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তার রচনাভঙ্গী ও বিষয়বস্তুতে।

২৩.৬ অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-৫১)

বাংলা সাহিত্যে অদ্বৈত মল্লবর্মণের নাম এখন খুবই পরিচিত। উপন্যাসের সংখ্যায় নয়, বিষয় ও রচনাকৌশলে। তাত্ত্বিকদের ভাষায় তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' আঞ্চলিক উপন্যাস। এই একটি উপন্যাসেই লেখকের খ্যাতি হলেও তিনি আরো অন্যান্য ধরনের সাহিত্যসৃষ্টি করে গেছেন।

তিতাস একটি নদীর নাম মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় ছাপা শুরু হয় ১৩৫২ বঙ্গাব্দে। বাংলার একেবারে উত্তরপূর্ব প্রান্তের যমুনা-মেঘনা বিধৌত অঞ্চলের একটি ছোট নদী তিতাস। তিতাসের তীরবর্তী ছোট একটি ভূখণ্ডের মৎস্যজীবী মালো সম্প্রদায়ের ভালমন্দ, নদীর সঙ্গে তাঁদের বাঁচা-মরার সম্পর্ক ও সুখ-দুঃখের কাহিনী এখানে বিবৃত। উপন্যাসটির চারটি খণ্ড, প্রতিটি খণ্ড দুটি করে পর্বে বিভক্ত: ১. তিতাস একটি নদীর নাম ও প্রবাস খণ্ড, ২. নয়া বসত ও জন্মমৃত্যু বিবাহ, ৩. রামধনু ও রাঙা নাও, ৪. দুরঙা প্রজাপতি ও ভাসমান। লেখক এই উপন্যাসে অনন্য তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য গল্প-উপন্যাস না থাকলেও একটি উপন্যাসেই তিনি পাঠকের অন্তরে স্থান করে নিয়েছেন।

একক ২৪ ❑ বাংলা ছোটগল্প

এই পর্যায়ের একেবারে প্রথমে (৪.১৯) অংশে বাংলা ছোটগল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক বাংলা ছোটগল্প হিসাবে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' গল্পটিকেই সার্থক প্রথম ছোটগল্প বলে সমালোচকগণ মনে করেন। তবে মনে রাখতে হবে এই ছোটগল্প পূর্বাবধি প্রচলিত নানান ধাঁচের গল্পের চেয়ে ভিন্নতর এক শিল্পরূপ বা প্রকরণ। এক নতুন ধরনের গল্প যা বড় গল্প, নীতিগল্প বা রূপকথার মতো নয়, উপন্যাসের ক্ষুদ্র সংস্করণও নয় কিন্তু উপন্যাস পাঠের স্বাদ পাওয়া যায়। উনিশ শতকেই এই বিশেষ ধরনের গল্পের উদ্ভব এবং বলা যায়, সাময়িক পত্রের তাগিদেই এই ধরনের গল্পের সৃষ্টি। সাময়িক পত্রে ধারাবাহিকভাবে মাসের পর মাস চলতে থাকা উপন্যাসের পরিবর্তে একটি/দুটি সংখ্যায় সমাপ্য, জীবনের খণ্ডিতাংশকে তুলে ধরে দ্রুত পরিণতির দিতে পৌঁছে পাঠকের মনে, পূর্ণতার স্বাদ বা সামগ্রিকতার স্বাদ এনে দেওয়াই ছোটগল্পের লক্ষ্য।

বাংলা সাহিত্যে এই ছোটগল্পের বা নতুন ধরনের গল্পের সূচনা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্থে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১২৮০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' গল্পটিকেই প্রথম যথার্থনামা ছোটগল্প হিসাবে সমালোচকগণ মনে করেন। এরপর সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অদৃষ্ট' ও 'দামিনী'র নাম করা যায়। এই সময়ে আরো অনেক গল্প লেখা হয়েছে, কিন্তু বাংলা ছোটগল্পের জগতে উল্লেখ করতে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম, যিনি বাংলা ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর প্রায় ৯৪টি গল্পে বাংলা ছোটগল্পকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর এই এতগুলি গল্পের আলোচনার সুবিধার্থে গল্পগুলিকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নেওয়া যায়। তাঁর ১২৮৪ বঙ্গাব্দের (১৮৭৭) 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভিখারিণী' গল্প দিয়ে যে গল্প রচনার সূচনা এবং ১৯৪১ সালের জুন মাসে লেখা ও ১৯৬২ সালে প্রকাশিত 'মুসলমানীর গল্প'— এই ৬৪-৬৫ বছরের গল্প রচনাকালকে পাঁচটি পর্বে ভাগ করা যায়। তবে এই ভাগ শুধুই কালানুক্রম নয়, ভাবগত, প্রকরণগত বিশেষত্বও এরই মধ্যে আছে: ১. সূচনা পর্ব 'ভিখারিনী', 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা' ও 'মুকুট', ২. শিলাইদহ পর্ব বা পদ্মাতীরের পর্ব, ৩. পদ্মা-পরবর্তী ও প্রাক্-সবুজপত্র পর্ব, ৪. সবুজপত্র ও তদুত্তর পর্ব, ৫. অন্তিমপর্ব (১৯৩৯-৪১)।

প্রথম পর্বের গল্প চারটিতে ছোটগল্পের বিশেষত্ব ততখানি বিকশিত হয়নি। পরবর্তী শিলাইদহ পর্বেই সবথেকে বেশী গল্প লেখা হয়েছে—৪৩টি। এখানে সার্থক আধুনিক ছোটগল্পের সার্থক প্রকাশ। এই পর্বের প্রথম ছয়টি গল্প 'দেনা ও পাওনা', 'পোষ্টমাস্টার', 'গিন্নি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান' ও 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং যথার্থ ছোটগল্পের সূচনা। এই পর্বের ৩৭টি গল্প 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'কঙ্কাল', 'জীবিত ও মৃত', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'সমাপ্তি', 'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রভৃতি বিখ্যাত গল্পগুলি এই সময়েই রচিত। এইসব গল্পে পদ্মালালিত জনপদের সাধারণ

মানুষ, তাদের জীবনযাত্রা ও প্রকৃতি ধরা পড়েছে। পরবর্তী অর্থাৎ তৃতীয়পর্বে ২৩টি গল্প লেখেন। এগুলির বেশির ভাগই 'ভারতী', 'বঙ্গদর্শন', 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত। এই গল্পগুলি হল— 'দুরাশা', 'পুত্রযজ্ঞ', 'কর্মফল', 'গুপ্তধন' প্রভৃতি। এ পর্যন্ত প্রায় ৭০টি গল্পে বাংলা ছোটগল্প বাল্য অবস্থা থেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছে। এর পরবর্তী দুই পর্বে প্রায় ২৪টি গল্পে বাংলা ছোটগল্পের সমৃদ্ধি। তার 'তিনসঙ্গী'র 'ল্যাবরেটরি', 'রবিবার', 'শেষকথায়' আধুনিক বাংলা সাহিত্য তথা যুগকে রবীন্দ্রনাথ স্পর্শ করেছেন। রবীন্দ্র-বিরোধীরাও তাঁর শেষ পর্বের এই গল্পের দ্বারা বিস্মিত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের গোড়াপত্তন ও বিকাশ ঘটিয়েছেন ঠিকই, তবে সেই সময় আরো অনেকেই গল্প লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম করতে হয়। তাঁর গল্পগুলি—'লুল্লু', 'বীরবালা', 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' প্রভৃতি গল্প 'ভূত ও মানুষ' নামে সংকলিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর 'মজার গল্প', 'ফোকলা দিগম্বর', 'ডমরুচরিত' গল্পসংকলনে অনেক গল্প আছে। তার গল্পের মধ্যে এক নতুন জাতের গল্পের স্বাদ পাওয়া যায়— সহজ জীবনবোধের সঙ্গে আজগুবি ও উদ্ভট রসের মিশ্রণে এক নতুন জাতের গল্প।

এই সময়কার আরেক জন্য শিল্পীর নাম করতে হয় যিনি এই সময়ে অর্থাৎ রবীন্দ্রযুগে ছোটগল্প রচনা করেছেন, তিনি স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁর গল্প সংকলন 'নবকাহিনী বা ছোট ছোট গল্প'। এখানে ভীমসিংহ, সন্ন্যাসিনী, লজ্জাবতী, কেন? প্রভৃতি গল্প সেকালে পাঠকসমাজ যে মুগ্ধ করেছে।

বিশ শতকের বাংলা ছোটগল্পকারদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম করতে হয়। উপন্যাসের মত তাঁর লেখা গল্পগুলিও পাঠককে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর 'মন্দির' (আত্মীয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে প্রেরিত) গল্প 'কুন্তলীন' পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়। এই গল্পের পর তাঁর 'বড়দিদি' উপন্যাসে গল্পটি তাঁকে পাঠকসমাজের সামনে আনে। তাঁর 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দুটি গল্পেই অতি সাধারণ অন্তজ দরিদ্র মানুষের গভীর বেদনার কথাই ফুটে উঠেছে।

এরপর গল্পরচনায় যাঁর নাম করতে হয়, তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অতি সাধারণ তুচ্ছ বিষয় ও তার সঙ্গে নিসর্গ চেতনায় যাঁর গল্পগুলি পাঠককে অন্য এক জগতে নিয়ে যায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন— 'মেঘমল্লার', 'মৌরীফুল' প্রভৃতি। 'পুঁইমাচা' গল্পে বাঙালি সমাজের দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। 'মেঘমল্লারে' এক অতীন্দ্রিয় জগতে পাঠকে পৌঁছে দেন লেখক।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক খ্যাতির পাশাপাশি ছোটগল্পের জগতের খ্যাতি যথেষ্ট। উপন্যাসের মতই গল্পেও পটভূমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাঢ়বঙ্গ। তাঁর 'নারী ও নাগিনী', 'বোবাকান্না', 'দেবতার ব্যাধি', 'ডাইনী', 'বেদেনী', 'জলসাঘর', 'অগ্রদানী', 'তারিণী মাঝি' প্রভৃতি গল্প সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। তাঁর গল্পসংকলনের সংখ্যাত প্রচুর— 'পাষাণপুরী', 'জলসাঘর', 'রসকলি', 'বেদেনী', 'হারানো সুর', 'ডাইনী' প্রভৃতি।

ছোটগল্প রচনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও উজ্জ্বল। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তাঁর 'অতসীমামী' প্রকাশিত হলে পাঠকসমাজ চমকিত হয়েছেল। তারপর তাঁর 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্প। দুটি গল্পেই অনন্যতার প্রকাশ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলনগুলি হল— 'অতসী মামী', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'মিহি ও মোটা কাহিনী', 'সরীসৃপ', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'শ্রেষ্ঠ গল্প' প্রভৃতি।

বাংলা কথাসাহিত্যে উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পও সমানভাবে পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অজস্র ছোটগল্প বাংলায় রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি গল্পকার সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা ছোটগল্পের ভাণ্ডার।

অনুশীলনী

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী:

১। কথাসাহিত্য বলতে কী বোঝায়? উনিশ শতকে বাংলা কথাসাহিত্যের যে নতুন যুগের সূচনা হল সে সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

২। বঙ্কিম-পূর্ব বাংলা উপন্যাসের একটি রূপরেখা তৈরি করুন।

৩। বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান নির্ধারণ করুন।

৪। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির পরিচয় দিন।

৫। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির পরিচয় দিন ও তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ লিখুন।

৬। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিশেষত্ব নির্ণয় করুন।

৭। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৮। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

৯। বঙ্কিমচন্দ্রে সামাজিক উপন্যাসগুলির পরিচয় দিন।

১০। ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় স্বতন্ত্র চিহ্নিত তার পরিচয় দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী:

১। 'আলালের ঘরের দুলাল' কার লেখা? এটি কোন ধরনের রচনা?

২। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির নাম লিখুন। এর মূল কাহিনি তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন?

৩। প্যারীচাঁদ মিত্রের সমসাময়িক কালে চলিত ভাষায় আরকে উপন্যাস রচনা করেছিলেন? প্রকাশকালসহ উপন্যাসটির নাম লিখুন।

৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বইগুলির নাম লিখুন। রচনাগুলি কি উপন্যাসের লক্ষণযুক্ত?

৫। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' কার লেখা? কবে বইটি প্রকাশিত হয়?

৬। 'কারা উপন্যাস' বলতে কী বোঝায়? দুটি কারা উপন্যাসের নাম লিখুন।

৭। রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম ও শেষ ছোটগল্পের নাম কী? কোন পত্রিকায় কবে গল্প দুটি প্রকাশিত হয়েছিল?

৮। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের অধ্যায়গুলির নাম কী? কোন পত্রিকায় এটি ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল?

৯। আত্মকথামূলক উপন্যাস বলতে কি বোঝায়? উদাহরণসহ লিখুন।

১০। 'সবুজ পত্র' পত্রিকাটি কার সম্পাদনায় কবে প্রকাশিত হয়? বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে পত্রিকাটির গুরুত্ব কোথায় লিখুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৬৬

২। সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'—২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড, আনন্দ

৩। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং

৪। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'—৫ম খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সি

৫। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য'

৬। ভূদেব চৌধুরী : 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', দে'জ

৭। শিশিরকুমার দাশ : 'বাংলা ছোটগল্প', দে'জ পাবলিশিং

৮। প্রমথনাথ বিশী : 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প', দে'জ পাবলিশিং

৯। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : 'কালের প্রতিমা', দে'জ পাবলিশিং

১০। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : 'কালের পুত্তলিকা', দে'জ পাবলিশিং

১১। অচ্যুত গোস্বামী : 'বাংলা উপন্যাসের ধারা', বিভাস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭

১২। তপোধীর ভট্টাচার্য : 'পড়ুয়ার উপন্যাস', অভিযান, কলকাতা, ২০১৮